

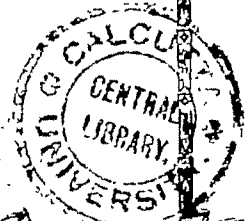
সংখ্যা, ২২৪, ২৬৫৮

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

চৈত্র মাস, প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা

CUR-NO 4902-58-130/03



পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

58



কলিকাতা, ২৪৩১, আপার সাতকুল্লাম রোড

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এন্ডির

হইতে প্রিন্টিং-ঘাট ও প্রকাশিত

সংস্কৃত সাহিত্য গ্রন্থমালা

শ্রীরাজশেখর বসু অনূদিত
কালিদাসের মেঘদূত

মূল, অনুবাদ, অম্বয়সহ ব্যাখ্যা ও টীকাসংবলিত

মেঘদূতের অনেকগুলি বাংলা পটভূমি আছে। পটভূমি বস্তুই স্বরচিত হউন মূল রচনার তাবলম্বনে লিখিত স্বতন্ত্র কাব্য। ইহাতে প্রথমে মূল শ্লোক, তা যথাগন্তব মূলানুযায়ী স্বচ্ছন্দ বাংলা অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে। এরূপ অনুবাদে সংস্কৃত রচনার স্বরূপ প্রকাশ করা যায় না, সেইজন্য পুনর্বার অম্বয়ের সঙ্গে যথাযথ ও প্রয়োজন অনুসারে টীকা দেওয়া হইয়াছে।

দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য দেড়

৪ 30 100
শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর অনূদিত
অশ্বষোষের বুদ্ধচরিত

অশ্বষোষ খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর আরম্ভে বর্তমান ছিলেন। কাব্যহিসাবে অর্থে বুদ্ধচরিত যুরোপীয় পণ্ডিতসমাজে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছে—তাঁহাদের মধ্যে কে-ইহাকে কালিদাসের কাব্যের সমপর্ষায়ের কাব্য বলিয়া মনে করেন। কোনো ভাষায় ইতিপূর্বে ইহার অনুবাদ হয় নাই।

দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য দেড় ট

শ্রীমা চৌধুরী অনূদিত
নারী-কবিগণ কর্তৃক রচিত
সংস্কৃত ও প্রাকৃত
কবিতাবলী

বাংলা ভাষায় কোনো অনুবাদ না থাকায় বৈদিক নারী-ঋষি ও তৎপরবর্তীকালের ন কবিদের রচনা এত কাল জনসাধারণের নিকট অপরিজ্ঞাত ছিল। এই গ্রন্থে ২৬ জন নারী-ঋষির ২৫৩টি ঋক, ৩২ জন নারী-কবির ১৪২টি সংস্কৃত কবিতা ও ৯ জন নারী-২ ১৬টি প্রাকৃত কবিতার বঙ্গানুবাদ মুদ্রিত হইয়াছে।

মূল্য দুই টা

বিশ্বভারতী

৬৩ ছারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা



সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
৫৮শ বর্ষ, ১ম-২য় সংখ্যা
১৩৫৮

বাঙ্গলা সাহিত্যের কবিতা ঐতিহাসিক কাব্য

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

পুরাতন বাঙ্গলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক গ্রন্থ অত্যন্ত বিরল এবং যে কয়টি ঐতিহাসিক গ্রন্থ, অর্থাৎ ঐতিহাসিক ঘটনাবিষয়ক কবিতাকারে লিখিত গ্রন্থের নাম জানা যায়, তাদের নির্ভরযোগ্য কোন বিবরণ বাঙ্গলা সাহিত্যের কোন ইতিহাসে নাই। স্থানীয় গ্রন্থ সম্বন্ধে গবেষণা করিতে গিয়া আমরা কতিপয় গ্রন্থের বিবরণ স্বাভাবিক বিজ্ঞানসম্মত ভাবে সংগ্রহ করার চেষ্টা করিয়াছিলাম। বাঙ্গলা সাহিত্যের একটা তমসাক্ষর অধ্যায়ের প্রথম তত্ত্ব পাওয়া যাইতে পারে মনে করিয়া ঐ বিবরণের সারাংশ লিপিবদ্ধ হইল।

১। রাজমালা (ত্রিপুরার ইতিহাস)

বাঙ্গলা সাহিত্যের এই প্রাচীনতম ইতিহাস-গ্রন্থের উপর গত ১২৫ বৎসর ধরিয়া যতটা চাচার সাধিত হইয়াছে, তাহার তুলনা হয় না। ফলে, মূল গ্রন্থটিকে বিলুপ্ত করার চেষ্টা র সফল হইয়াছিল। কিন্তু সত্যের বীজ কখনও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না—প্রাচীন হস্তলিখিত রাজমালার একটি সম্পূর্ণ প্রতিলিপি আমাদের নিকট প্রাপ্য এবং তাহা সম্যক পরীক্ষার সুযোগ পাওয়ায় আমরা ‘রাজমালা’ গ্রন্থটি সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য আনিতে পারিয়াছি। এর প্রথমার্শ ১৫ পাতায় সম্পূর্ণ। আরম্ভ স্বাধীন,

সমস্তি দেবপদ করিয়া বন্দন ।
দ্বিতীয়ে শ্রীহরি বন্দি নন্দন নন্দন ॥
তৃতীয়ে সঙ্কর বন্দি সহিতে বনিতা ।
ভগবতের পতি শিব ভগত বিধাতা ॥
আর যত দেবদেবি আছে ত্রিভুবন ।
অসেল প্রণাম মোর তান শ্রীচরণ ॥
ভজিতে প্রণাম করি চক্ষের চরণে ।
দাহার বংসের কিছু করিব রচনে ॥
শ্রীধর্মমণিক্য নাম ত্রিপুরচূড়ামণি ।
দানবর্গে শুচরিত্রে রাজসিরোমণি ॥

সেই রাজা একদিন বসি সিংহাসনে ।
আপনা বংসের কথা হইয়া গেজ মনে ॥

আপনার সভাসদ ব্রাহ্মণকুমার ।
 বাণেশ্বর শুক্রেয়র বিভাতে অপায় ॥
 ইন্ডের সভাতে ছেন বৃহস্পতি গণি ।
 নানা পাত্ৰ জানেন বিদ্যাত চূড়ামণি ॥
 আর দুস্তৰ্ভেদ নাম চোড়াই প্রশান ।
 রাজবংশকথাতে বড়ই সাবধান ॥
 চতুর্দশ দেবপূজা হইয়াছে পমোষি ।
 তাহাতে ভুবিদ রাজবংশ কথা বিধি ॥
 সেই বিধিবর পাইয়া চোড়াই বটে ।
 সে জেই কথা জানে অচেতে না বটে ॥
 চতুর্দশ দেবতা পূজাতে কথা আছে ।
 কুলক্রমে জানিআছে অসেস বসেবে ॥

শেষ কথা,

এধিদ্ধপে মহাবাজা শ্রীধর্মমাণিক্য ।
 করিল অতে(ক) ধর্ম কহিতে অসঙ্গ ॥
 পূর্বে ঘড় লিখিছিল ত্রিপুরভাসাতে ।
 পয়ার করিল গাথা সকলে বুজিতে ॥
 সভাসাতে ধর্মরাজা ব্রাহ্মণা কৈল ।

পূর্বপুরুষের নাম পুস্তকে লিখিল ॥ (১৫১২)

এ স্থলে সরল সত্য কথাই লিখিত হইয়াছে যে, রাজমালার এই খণ্ডে যাহা কিছু লিপি হইয়াছে, তাহা “সাবধান” দুর্ভেদ্য চোড়াই সাগরসদৃশ চতুর্দশ দেবপূজাবিধি হইতে উৎকৃষ্টাছিলেন; কারণ, তিনি কুলক্রমে সকল কথা জ্ঞাত ছিলেন। পরে যে প্রাচীন গ্রন্থ গ্রন্থের নামোল্লেখ আছে—রাজমালিকা, যোগিনীমালিকা, লক্ষণমালিকা ও হরগৌরীসম্বাদ তাহা অধুনা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত এবং কোনটাই ভারতীয় শাস্ত্রগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত নহে। এখা উল্লেখযোগ্য যে, “হরগৌরীসম্বাদ” নামে একটি গ্রন্থের প্রতিলিপি অজ্ঞাপি কামরূপ অঞ্চল পাওয়া যায়। আমরা একটি প্রতিলিপি নবদ্বীপ পাঠাগারে দেখিয়াছি (পত্রসংখ্যা ৮ আধুনিক আসামী অগ্রহালে লিখিত)—দিগ্বিজয়প্রকাশ ও দেশাবলীবিবৃতির স্থায় কতি কথায় পরিপূর্ণ অতি তুচ্ছ ও নগণ্য গ্রন্থ। অথচ গভর্নেন্ট ট্রাভিলিং পণ্ডিত তারকা চূড়ামণি ইহা মূল্যবান বোধে সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন। দুই একটি আঙ্গুবি নমুনাস্বরূপ উদ্ধৃত হইল। ভোজ নৃপতির সম্বন্ধে আছে :—

এহাধর্মরসে শাকে স্নেহানু জিত্বা বিমাজতঃ ।

ডিল্লীশনগরে স্বাম্যং করিষ্যতি স সুপতিঃ ॥

আসীং জ্যেষ্ঠায়ুগে কশিং ডিল্লীশো নাম দৈত্যমাই। ইত্যাদি (৬২ পত্র)

বিবৃতির দ্বারা ইহাতে কল্যাণের শূভাস্ত্র ফুল তারিখের উল্লেখ নাই—একেবারে
কাব্য—দিল্লীর ভোজরাজ্যের তারিখ হইল ৬০৯ শকাব্দ (৬৮৭-৮ খ্রী:) ॥ এইরূপ
ছড়াছড়ি গ্রন্থমধ্যে রহিয়াছে। ভগদত্তের পুত্র ধর্মপাল ১০৫ বৎসর রাজত্ব করেন—
কালকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন। নরকবংশীয় রাজাদের আত্মাকর-স্থি-
তি—

জ-স-ন-শ-ভ-বা-তা-ম-ব-জ-হা-প-ধ-দা-চ-লাঃ ।

অ-মা-স-তো-ম-জ-গো-মাঃ স্ববংশে নরকাগ্নয়ে ॥

মোট রাজত্বকাল ১০০৫ বৎসর (৮১২ পত্র)। এই খণ্ডেও ‘কোটিলিঙ্গসমাকুল’
রূপে ত্রিপুরার বিবরণ আছে (৪১১ প্রভৃতি)। এক স্থলে (৩৯ পত্র) মোগল
ইম্প্রাবিজয়ের উল্লেখ আছে :—

যবনৈর্নরমানা তু ত্রিপুরা পরমেশ্বরী ।

রাজশূদ্রা ভবেদেবি যাবৎ ত্রিবর্ষমাবহে ॥

কস্তাপি তত্র ভূপত্বে মরণাদিকমীক্ষতি ।

তন্তু পুত্রাশ্চ চত্বারো যবনৈরধিতৈ অপি ॥ ইত্যাদি ।

শোমাণিক্যের (স্বন্যাক্ষ ১৫০১ শক, অভিষেকযুগে ১৫২২ শক) সময়ের ঘটনা ।

বহু পরে (ইংরাজ অধিকারের আরম্ভসময়ে) এই গ্রন্থ রচিত হইয়া থাকিবে ।

—লাল উপজীব্য “হরগৌরীসম্বাদ” এই গ্রন্থ অবশ্যই নহে—কিন্তু ইহারই পূর্বপুরুষ বটে !

লাল লিখিত আছে যে, ধর্মমাণিক্য প্রশ্ন করিয়াছিলেন :

ত্রিলোচন নামে রাজা ত্রিপুরের কুলে ।

হবেনি তেমত রাজা ধর্ম সাক্ষবলে ॥

বাণেশ্বর শুভ্রেশ্বর দুই বিজবর ।

রাজ্যকণা যুনি তারা দিলেক উত্তর ॥

জে বলিলা নৃপমণি কহি সাক্ষবলে ।

এক মহারাজা হবে ত্রিপুরার কুলে ॥

হরগৌরীসম্বাদেত কহিছে সন্ধরে ।

রাজমাণিকাতে আছে যুনি নৃপবরে ॥

ই বলিলা দুই দ্বিজে পুস্তক আমিল ।

হরগৌরীসম্বাদেত প্রমাণ জানাইল ॥ (১৫১১ পত্র)

১ অস্ত্র পুণি হইতে এই অতিবিশ্ময়কর প্রমাণ উদ্ধৃত করিতেছি :—

অথ শ্লোকঃ । দৈবর উবাচ :—

বর্ষান্তে তু পতে ভূপে ক্রোধস্তাক্ষো ভবিষ্যতি ।

সদাধ্যাক্ষেয়ুধাক্ষং ততোহসৌ ন ভবিষ্যতি ॥

রাজবংশের আদিপুরুষ ত্রিলোচন শিবের বরে “স্তিন চক্ষু” (৪১১ পত্রে) হইয়া জন্মিয় শ্লোকানুসারে অভিরিক্ত চক্ষুটি (ক্রোধস্তাক্ষঃ) পুরুষাঙ্কুরে “বর্ধাস্ত” রাজা পর্য্যন্ত বৎসর ধরিয়া (অঙ্কুর বামা গতিঃ হইলে, নতুবা ১৩৯২ বৎসর হয়) থাকিবে, পটে পাইবে। কল্যাণমাণিক্যের পুত্র গোবিন্দমাণিক্যের সময়ে ১৫৯১ শকে রাজমালায় পরিবর্দ্ধনকালে কোন মোসাহেব শ্লোকটির ব্যাখ্যা করিলেন, ‘ক্রোধস্তাক্ষঃ’ অর্থ মাণিক্য এবং ধর্মমাণিক্যের সভায় শুক্রেখর-বাণেশ্বরের মুখ হইতে ভবিষ্যদ্বক্তিরূপে ঐ প্রচার করাইলেন। শ্লোকটির অন্তত্ব পাঠ নানারূপ পাওয়া যায় ‘সর্ধাস্তাস্তে...ক্রোমি প্রভৃতি। বোধ হয় এইরূপ কোন অন্তত্ব পাঠ অথবা স্বকপোলকল্পিত বিভ্রুতি (ধর্ম্যঃ অবলম্বন করিয়া বিখ্যাত ঐতিহাসিক কৈলাসচন্দ্র সিংহ (১২৫৮-১৩২১ সাল) করিলেন, শ্লোকটিতে ধর্মমাণিক্যের অভিষেকশকাঙ্ক ১৩২৯ (?) লিপিবদ্ধ আছে (রা ১৩০৩ সনে মুদ্রিত, পৃ. ৩৮ ; ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত, ১৮৭৬ খ্রী. পৃ. ১৩)। তাহাই বিনা প্রায় সর্বত্র পরিগৃহীত হইয়া আসিতেছে। রাজমালায় ধর্মমাণিক্যপ্রদত্ত অধুনালু তান্ত্রপট্টের মূল পাঠ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা কল্পিত হইতে পারে না। কারণ, কালনির্দেশটি ১৩৮০ শক যেষসংক্রান্তি, শুক্লা ত্রয়োদশী, সোম বার—অভাস্ত সত্য ; পাওয়া যায় ১৪৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ২৭ মার্চ চৈত্রসংক্রান্তি দিন বসন্তভই শুক্লা ত্রয়োদশী ও তেঁ ছিল। এইরূপ গণনাগুরু অভাস্ত বসন্ত কৃত্তিমরচনাকারীর লেখনী হইতে কখনও বাহি না। মূল রাজমালা ১৪৫৮ খ্রীষ্টাব্দের পরে ১৪৯০ খ্রীষ্টাব্দের অর্ধাৎ পরবর্তী ধর্মমাণিক্যের অভিষেকশকাঙ্কের কিছু কাল পূর্বে ১৪৭০-৮০ খ্রী মধ্যে রচিত হইয়া জুতরাং রাজমালা বাঙ্গলা সাহিত্যের আদিম যুগের একটি মূল্যবান গ্রন্থ। আমরা ব বোধে “ত্রিপুর-বংশাবলী” প্রভৃতি অত্যন্ত অপ্রামাণিক গ্রন্থের লেখা এবং তদনুযায়ী অ (শ্রীরাজমালা, প্রথম লহব, পৃ. ৮১-৮২) খণ্ডন করিলাম না। এই গ্রন্থের প্রাচীন বর্তমানের আবিষ্কৃত হওয়ার কোনই সম্ভাবনা নাই—কালে কালে সংযোজিত পরবর্তী অ সহিত একসঙ্গে ইহা গ্রথিত হইয়া আছে এবং তাহার মূল ভাষার উপর হস্তক্ষেপ হই সন্দেহ নাই। এই গ্রন্থের পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক ভাগবয়ের সাতাংশ আমরা প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছি (প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৫৪, পৃ. ৪২৫-৬)।

১২৩৮ ত্রিপুরাব্দে (অর্থাৎ ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে) মহারাজ কাশীচন্দ্রমাণিক্যের রাজত্ব (১৮২৬-৩০ খ্রী) দুর্গামণি উজীর সমগ্র রাজমালা সংশোধন করিয়া প্রাচীন রাজমা-
অন্ত্যেষ্টবিধান করেন। কারণ দুর্গামণির ভাষায়ই লিখিত হইল :—

পুরাতন রাজমালা আছিল রচিত,
প্রসঙ্গেতে অলম্বিক ভাষা যে কুৎসিত।
পূর্ব প্রসঙ্গ পরে পর পূর্বে কত,
সেইত কারণে লোকে নাহি বুঝে যত।

ত্রিপুরা রাজ্যের নাম ত্রিপুর যেমতে,
 ত্রিপুর রাজ্যের প্রমাণ না লিখিলে তাতে ।
 বায় শ আটত্রিশ সন ত্রিপুরা যখন,
 তাহাকে লুপ্তি পুনি উজ্জীর দুর্গামণি ।
 মহাতারতালি তল্প করি অধেষণ,
 প্রমাণ লিখিল তার বেদনিরূপণ ।
 এহাতে দিকৃষ্ণি যদি কাহার জন্ম,
 পুমাণাদি দর্শিলে যে দুচিবে সংশয় ।

(রাজমালা, অপ্রকাশিত মুদ্রিত সংস্করণ, পৃ. ২৭১)

অর্থাৎ মহাতারতের সভাপর্ক ও ভীষ্মপর্কের স্রোকে 'ত্রিপুর' ও 'ত্রৈপুর' শব্দের উল্লেখ এবং পীঠমালাতন্ত্রের বচন সংযোজন করিয়া বংশের আভিজাত্য কৃত্রিম উপায়ে বর্দ্ধিত করা হইল। আর, 'ক্রতুবংশে দৈত্যরাজ্য' কথাটা যোজন্য করিয়া ক্রতুও আদিপুরুষরূপে কল্পিত হইল। তদ্ব্যতীত গ্রন্থমধ্যেও অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল। কিন্তু দুর্গামণি দুইটি বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন নাই। কাশীচন্দ্রমাণিক্য পর্য্যন্ত ত্রিপুররাজবংশ শূদ্রাচারে মাসাশৌচ পালন করিতেন, গোত্র বলা হইত "কান্ত্রপ"। কৃষ্ণকিশোরমাণিক্যের সময়ে (১৮৩০-৪২ খ্রী.) ক্ষত্রিয়াচার প্রবর্তিত হয় এবং গোত্র বলা হয় "বৈয়্যাপ্ত"। দুর্গামণি মাসাশৌচ বিধানের কথা প্রাচীন রাজমালা অবলম্বন করিয়া প্রথমতঃ গোপন করেন নাই :—

বর্ণসঙ্কর হইলেক রাজ্য জিলোচন,
 কলিয়ুগে ক্ষত্রি জাতি না যবে কারণ ।
 বেদ বেদান্ত তন্ত্রে দ্বিজে বিধি দিল,
 তদবধি মাসাশৌচ জিলোচনের হৈল ॥ (এই, দক্ষিণ খণ্ড, পৃ. ৩৯)

প্রাচীন রাজমালার পাঠ যথা,

বর্ণসংক(র) বলিয়া রাজ্য জিলোচন ।
 কলিতে ক্ষত্রি জাতি না যবে কারণ ।
 বেদবেদাদ জামে দ্বিজে বিধি দিল ।
 সেই হতে এক মাষ অযুচ আচরিল ॥ (৯১১ পঙ্ক)

কিন্তু পরে এই দুইটি পয়ার তুলিয়া দেওয়া হয় (এই, প্রথম লহর, পৃ. ৩৪)। দ্বিতীয়তঃ, ক্রতু হইতে দৈত্য পর্য্যন্ত অন্তর্ভুক্ত পুরুষের নাম দুর্গামণি পান নাই। সংস্কৃত রাজমালা গ্রন্থের সংশোধনকালে ১৮১০ শকাব্দে (১৮৮৮ খ্রীঃ) পুরাণ হইতে অধস্তন ১০ পুরুষের নাম (শতবর্ষা পর্য্যন্ত) সংযোজিত হয় (সংস্কৃত রাজমালার আধুনিক প্রতিলিপি, পৃ. ৮-৯)। ১৮৮২ খ্রীঃ ত্রিপুরার বিখ্যাত সামাজিক আন্দোলনের পর এদিকে রাজবংশের দৃষ্টি পতিত হইয়াছিল বুঝা যায়। ১৩০৫ ত্রিপুরাব্দে (১৮৯৫ খ্রীঃ) "রাজরত্নাকর" নামক সংস্কৃত গ্রন্থের পূর্ববিভাগ (১২-সর্গাঙ্ক ১২৭ পৃ.—ক্রতু হইতে প্রতর্দন পর্য্যন্ত ২৬ পুরুষের বিবরণ)

ত্রিপুররাজধানী হইতে মুদ্রিত হয়। প্রচার করা হয়, ইহাই শুক্রেখর-বাণেশ্বররচিত মূল গ্রন্থ :—

“শুক্রেখরো তচ্চ তদুতাং দেবভাষমা ।” (১১২৫ শ্লোক)

এইরূপ কৃত্রিম রচনার উদাহরণ বিশাল সংস্কৃত সাহিত্যে দ্বিতীয়টি আর পাওয়া যাইবে না। প্রকৃতপক্ষে যে পণ্ডিত দ্বারা এই গ্রন্থ ৬০৭০ বৎসর পূর্বের রচনা করান হইয়াছিল, তাঁহার নাম অনেকের নিকট অজ্ঞাত নহে। সৌভাগ্যের বিবয়, মূল রাজমালার ঘটনাংশ এই গ্রন্থ দ্বারা ব্যাহত হয় নাই।

রাজমালার পূর্ববর্তী খণ্ডগুলির পরিচয় অতি সংক্ষেপে প্রদত্ত হইল। “চুর্জয়খণ্ড” নামক দ্বিতীয় খণ্ড অমরমাণিক্যের সময়ে (১৪২২-১৫০৮ শকাব্দ) রচিত হইয়াছিল। যথা,

অমরমাণিক্য নাম নৃপতি আছিল।

ত্রিপুরবংশের কথা তৎপন্ন মূলিল ॥

ঐশ্বর্যমাণিক্য ছিল ত্রিপুরসম্ভূতি।

রাজবংশ বিস্তারিছে রাজমালা পুণী ॥

পুস্তক লিখাইছে তেনি পূর্বরাজার কথা।

তাম পরে রাজা সব মা বহিছে গাঁথা ॥

অমরমাণিক্য রাজা স্থির করি মন।

জিজ্ঞাসা উচিত রণচতুরনারায়ণ ॥

এক সত পঞ্চ বর্ষ বয়স ওহার।

স্থিরমতি গুণবস্ত্ত ধর্ম্যতা অপার ॥

সুনয় বলি রণচতুরনারায়ণ।

রাজবংশকথা কিছু কহত আপন ॥

বয়সে বিসিষ্ট বট ত্রিপুরসম্ভূতি।

তোমি জ্ঞান ভাল পূর্বরাজাগণ নিতি ॥

ঐশ্বর্যমাণিক্যপরে জত রাজা হৈল।

কে রূপে সে রাজা সবে প্রজাকে পালিল ॥

কোন রাজা কিবা কশ্ম করিল তখন।

কহত সে শব কথা যুনিব অধন ॥

নৃপতির বচনে কহন্ত সেনাপতি।

পূর্বের প্রসঙ্গ বলি মুন মহামতি ॥

ঐশ্বর্যমাণিক্যাবধি জত রাজা হৈল।

অমুক্ষমে সেনাপতি সকল কহিল ॥ (১৫-১৬ পত্র)

চুর্জামণি এই মূল্যবান বিবরণ ৪ পয়্যারে সংক্ষিপ্ত করিয়া এ স্থলে রাজমালার সংশোধনকার্য্য করিয়াছেন (রাজমালা, অপ্রকাশিত সং, পৃ. ৮৫ ; দ্বিতীয় জহর, পৃ. ১)। প্রথমধ্যোও বহুল

পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে, তাহার কষ্টসাধ্য বিশ্লেষণ ব্যতীত প্রকৃত ইতিহাস লিখিত হইতে পারে না। প্রাচীন রাজমালার এই ঋণ উদয়মণিক্যের বিবরণ পর্যন্ত আসিয়াছে। গ্রন্থশেষ যথা,

এত জদি রণচতুরনারায়ণে কৈল ।
অমরমাণিক্য রাজা সন্তোষ হইল ॥
পূর্ব২ দুপতির যুগ্মিলেক কথ্য ।
“দত্যধ্বং” পুঁবি তবে করিলেক গাঁথা ॥
“দুর্ধ্যধ্বং” বলিয়া পুস্তক নাম রাখি ।
ঐশ্বর্যমাণিক্য হতে রাজা তাতে লিখি ॥
সেই পুস্তক পরে গোবিন্দদেবে পাইল ।
তাহার পরে রাজা পুস্তক রাখিল ॥

ইতি দুর্ধ্যধ্বং সমাপ্ত ॥ (৩৩১ পত্র)

এই মূল্যবান নির্দেশের দুইটি প্রধান কথা দুর্গামণি বাদ দিয়াছেন—এই ঋণের নাম “দুর্জয়ধ্বং” এবং গোবিন্দমাণিক্যকর্তৃক গ্রন্থপ্রাপ্তি।

তৃতীয় ঋণের নাম “উত্তর দুর্জয়ধ্বং”। যথা,

ইতি উত্তরদুর্জয়ধ্বং কল্যাণমাণিক্য অর্পারোহণ (৫৬১ পত্র)

ইহা গোবিন্দমাণিক্যের সময় লিখিত হইয়াছিল। যথা,

গোবিন্দমাণিক্য রাজা বড় পুণ্যবান ।
পূর্ব২ রাজা সবেয় যুগ্মিয়া বাধান ॥
ঐশ্বর্যমাণিক্য রাজা পূর্বে জিজ্ঞাসিল ।
দুগ্ধভেজ চন্ডাই তাহাতে কহিল ॥
তায় পরে অমরমাণিক্য জিজ্ঞাসিল ।
রণচতুরনারায়ণে তাহাতে কহিল ॥
পূর্বরাজাশুণ্যগানে পুস্তক লিখিল ।
অমরমাণিক্য হতে রাজা না লিখিল ॥
তায় পরে জে জে রাজা হইল জিগুরে ।

কেবা কোন কর্ম কৈল কহ “মন্ত্রিবরে” ॥ (৩৩২ পত্র)

এ স্থলে মন্ত্রিবরের নাম লিখিত নাই। আশ্চর্যের বিষয়, দুর্গামণির মতে এই ঋণ রামমাণিক্যের সময়ে “দ্বারপণ্ডিত” সিদ্ধান্তবাগীশকর্তৃক রচিত হইয়াছিল (রাজমালা, অপ্রকাশিত সং, পৃ. ১৭৭ ও ২৭০)। ইহা সম্ভবপর বলিয়া আমাদের মনে হয় না। তুলাপূর্ব দান উপলক্ষ্যে কল্যাণমাণিক্য উক্ত সিদ্ধান্তবাগীশকে প্রচুর দানাদি দ্বারা সম্মানিত করিয়াছিলেন। যথা,

ভট্টাচার্য্য সিদ্ধান্তবাগীষ মহামতি ।

বহুল সম্মান তামে করিল দুপতি ॥

সোনার কুণ্ডল আঁধি ছত অভরণ ।
 নরপতি তায়ে দিয়া করিল ভূসন ॥
 এক হস্তি দিল ভানে সুস্ব্য করিয়া
 মেহেরকুলেত গ্রাম দিল উৎসর্গিত ॥ (৫৩২ পত্র)

এই বর্ণনা সিদ্ধান্তবাগীশের স্বরচিত হওয়া সম্ভব নহে। দ্বিতীয়তঃ, প্রাচীন রাজমালাঃ ১১৭৫ ত্রিপুরাঞ্জে লিখিত একটি প্রতিলিপির আধুনিক অঙ্কলিপি আমরা পরীক্ষা করিয়াছিলাম। তাহাতে স্পষ্ট লিখিত আছে,

ঐশ্রীযুত গোবিন্দমাণিক্য নরপতি ।
 দৈবযোগে আপনে পাইলো সেই পুণি ॥
 ঐশ্বর্যমাণিক্য হনে যত রাজ্য হৈল ।
 দৈত্যবধ পুস্তকেত নাম গাথা হৈল ॥
 শ্লোক ॥ ১৫৯১ ॥

একাধিকমবত্যায়ে শাকে পঞ্চদশে তথা ।
 ঐশ্রীযুতগোবিন্দদেবেন লিখ্যরাস (৭) যত্নতঃ ॥

রাজমালার দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডে ত্রিপুরার ইতিহাসের স্বর্ণযুগের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে তাহা গবেষিত ও লিখিত হয় নাই।

রাজমালার চতুর্থ খণ্ড কৃষ্ণমাণিক্যের অমরোদেব উজীর লিখাইয়াছিলেন। যথা,

কৃষ্ণমাণিক্য রাজ্য স্বর্ণপরায়ণ ।
 একদিন বসিআছে লইয়া পাত্রেগণ ॥
 পুনরুজ্জি উজীরেত জিজ্ঞাসে রাজম ।
 রাজমালা প্রস্তাব হইল স্বরণ ॥
 উজীরে কহেন রাজ্য করি নিবেদন ।
 গোবিন্দমাণিক্য ছিল স্বর্ণপরায়ণ ॥
 অমর্য্য বিবরণ পূর্বের লিখন ।
 তার পরে লিখাইব সার বিবরণ ॥
 বুদ্ধেত আছরে জে বিশ্বাসনারায়ণ ।
 বিশ্বাস হএ জানে আইক বিবরণ ॥
 রাজআজ্ঞা হইলেক ডাকে মজিবর ।
 গোবিন্দমাণিক্য লিখ সার আবাস্তর ॥ (৫৭ পত্র)

বিশ্বাসনারায়ণলিখিত এই খণ্ডে অমরমাণিক্য পর্যন্ত রাজাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে (৬৫২ পত্রে প্রায় শেষ)। হুর্গামণির প্রক্ষেপে কিন্তু বিশ্বাসনারায়ণের নাম নাই। বহু পরবর্তী রাজা রামগঙ্গামাণিক্যের সময়ে বুদ্ধ অমরোদেব উজীরের আদেশে অমরোদেবের পুত্র স্বয়ং হুর্গামণি গোবিন্দমাণিক্যাবধি পৃথক্ প্রায় রচনা করিয়াছিলেন এবং তাহাই ক্রমশঃ পরবর্তী রাজার

সাহিত্য সহযোগে পরিবর্তিত হইয়াছে (রাজমালা, অপ্রকাশিত সং, পৃ. ২৭২-৩, ৩২২, ৩৪২, ৪০৭)। রাজমালার যে মূল্যবান প্রতিলিপির সাহায্যে এই বিবরণ লিখিত হইল, তাহা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২২৫২ সংখ্যক বাঙ্গলা পুথি।

২। কৃষ্ণমালা

রাজা কৃষ্ণমাণিক্যের অতিবিদ্যুত জীবনকাহিনী। দুর্গামণির রাজমালায় লিখিত আছে :—

উজীর বলে বিজয়মাণিক্য অভ্যস্তরে।

কৃষ্ণমাণিক্য মহারাজা হৈল তার পরে ॥

তাম কীর্ষি রাজধরমাণিক্য আদেশে।

জয়ন্ত চত্বাই পুর্বে বলিছে বিশেষে ॥

কৃষ্ণমালা নাম পুস্তক বিস্তার কাহিনী।

রামগঙ্গা বিশারদ রচিল তখনি ॥

রাজমালা মধ্যায়ত কৃষ্ণমালা হয়।

বিস্তার দেখিয়া লোক শুনিতে সংশয় ॥ (পৃ. ৩২৯)

স্বর্গত কালীপ্রসন্ন সেন মহাশয়ের সৌজন্তে এই বৃহৎ গ্রন্থের একটি আধুনিক প্রতিলিপি পরীক্ষা করিতে পারিয়া আমরা কৃতার্থ হইয়াছি। বাঙ্গলার ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা তমসাক্ষর যুগের একজন সাক্ষাদর্শীর উৎকৃষ্ট বিবরণ এই গ্রন্থমধ্যে লিপিবদ্ধ হইয়াছে এবং রাজ্যলুপ্ত সুবরাজ কৃষ্ণমণির রোমাঞ্চকর ভ্রমণকাহিনী এবং অস্ফাট বহু ঘটনার অতি পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা ইহাতে পাওয়া যায়, বাহা অন্যত্র পাওয়ার কোনই সম্ভাবনা নাই। ত্রিপুরার পূর্বতন রাজতন্ত্র সহস্র সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়া যে দুর্গামণিসংশোধিত রাজমালার অসমাপ্ত সংস্করণ করিয়াছেন, অল্প ব্যয়ে কৃষ্ণমালার মূল মাত্র মুদ্রিত করিয়া তাহারা বহু হইতে পারিতেন। বাঙ্গলার একটি জাতীয় সম্পদরূপে গ্রন্থটি রক্ষিত এবং মুদ্রিত হওয়া আবশ্যক। ১৭০৭ শকাব্দ হইতে ১৭২৪ শকাব্দের মধ্যে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। আমরা একটি মাত্র অক্ষুণ্ণ নিদর্শনরূপে উদ্ধৃত করিতেছি। চাটগ্রামের প্রথম ইংরাজ শাসক ছিলেন বিখ্যাত Harry Verelst সাহেব (১৭৬১-৬৪ খ্রী.)। তাহার কাছাড় অভিযান অস্ত্রাঙ্গি রহস্যবৃত্ত রহিয়াছে। তৎসম্বন্ধে কৃষ্ণমালার বর্ণনা (পৃ. ৩৮৫-৯২) এই :—

তার পরে নরপতি আসিল কসবার। পুরীতে রহিল আসি উপর কিল্লার ॥

হেম কালে সৈন্ত সমে চাটগ্রাম হতে। “হাতি বিলিস” সাহেব আসিল কসবারে ॥

ত্রক্ষার বেশেতে গিয়া করিতে বিজয়। শঙ্ক হইয়া চলিছিল লইয়া সৈন্তচর ॥

“মুল টন” সাহেব আসিল কাপ্তান্। লপ টন্ “ইষ্টবিল” সহিতে তাহান ॥

আষ্টম ইংরাজ এসব প্রভৃতি। কসবার আসিল যথায় নরপতি ॥

“গরুল ঘোষাল” সাহেবের দেওয়ান । তাসবার সঙ্গে ছিল জাকপ্ৰধান ।
 কতগুলি ঘোরা আর কতক সিপাই । চলিছে সাহেব সঙ্গে লেখা যোণা নাই ।
 ছাড়ি বিলিস সাহেব এসব সঙ্গে করি । উপস্থিত হইল যদি কসবা নগরী ॥
 রাজা আসি সাহেবের সহিতে মিলিল । নৃপতিকে দোষণা সাহেব সজ্ঞাযিল ॥
 ইষ্টালাপ পরস্পরে ছিল বহুতর । তার পরে গেল রাজা আপনার ঘর ॥
 আনাইয়া ভক্ষণ সামগ্রী বহুতর । সাহেব নিকটে পাঠাইল নৃপবর ॥
 দোলাঘাড়া উপস্থিত হইল তখন । করিলেক নৃপতি তাহার আরোহণ ॥
 বিধিমত দোলাঘাড়া করি সমাপন । পাঠাইল সাহেব নিকটে নিমন্ত্রণ ॥
 ইংরাজ সকলে পাইয়া নিমন্ত্রণ । রাজপুরে গেল ছলি বেলায় কারণ ॥
 সভাতে বসিল গিয়া রাজার বিধিত । আতর গোলাপগন্ধে সভা আয়োজিত ॥
 ভুগন্ধি আবিরচূর্ণ আনি ভারে ভার । পুঞ্জ পুঞ্জ করি রাখে সভার মাঝার ॥
 পাণ্ডগণ সহিতে বসিল মহারাজ । ছাড়ী বিলিস সাহেব প্রভৃতি ইংরাজ ॥

...

...

...

এই মতে ছলিবেলা যত নির্ঝাঁহিল । নরপতিপাষে তবে সাহেবএ কহিল ॥
 জ্ঞানর দেশেতে আমি করিব গমন । লইব যে সেই রাজ্য করিয়া দমন ॥
 আমার সহিতে যদি চলহ আপনে । অবশ্ত জিনিব রণে লয় মোর মনে ॥
 অতএব মোর সঙ্গে চল নরপতি । শুনিয়া নৃপতি কহে সাহেবের প্রতি ॥
 রাজ্যকার্য ছাড়ি আমি না পারি যাইতে । মুখ্য এক পাত্র দিব তোমার সহিতে ॥

...

...

...

আমার দক্ষিণ বাহু জয়দেব রায় । তাহাকে সহিতে নেও দিলাম তোমায় ॥
 ভাল বলি তুই হৈয়া কহিল সাহেবে । তা সবেব সহিতে চলিল জয়দেবে ॥
 তান সঙ্গে চলে সুচিদর্পনারায়ণ । প্রণমিয়া নৃপতিকে চলে দুই জন ॥
 কান্ধনের আটাইশ দিনে তথা হতে । চলিলেক দুই জন সাহেব সহিতে ॥
 হিড়িম্ব দেশেতে গিয়া উপস্থিত হইল । শুনি রাজা রাজ্য ছাড়ি পলাইয়া গেল ॥
 বাহুপুরে নিজপুরী আপনী পুড়িয়া । পরিবার সমে বনে গেলেন ছাড়িয়া ॥
 ছাড়ী বিলিস সাহেব রহিল সেই দেশে । জয়দেব ঠাকুর রহিল তান পাশে ॥

কসবানগরে রাজার সহিত বাঙলার ভাবী শাসনকর্ত্তা Harry Verelst হলি খেলিয়াছিলেন, ইহা একটা কৌতুকজনক ঘটনা বটে। দুর্গামণির রাজমালায় (পৃ. ৩৩৫) ৩ পর্যায়ে এই ঘটনা উল্লিখিত হইয়াছে। সমকালীন বহু ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। মির কাসীমের দেওয়ান বন্দাবনকর্ত্তক চাকা সহর জুট (পৃ. ৩৯৪), সমসের ডাকাইত কর্ত্তক রাজ্যলাভ, হিড়িম্বাবিক্রম প্রভৃতি! কৃষ্ণমাণিক্যের নিজের বিবরণ অতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে এবং তন্মধ্যে স্থানীয় ইতিহাসের বহু উপকরণ পুঞ্জীভূত হইয়া আছে।

৩। গাজিনামা বা সমসের গাজির গান

লেখ মনোহর-রচিত এই গ্রাম্য গীতিকা অধুনা অপ্রসিদ্ধ নহে। যে জীবনকাহিনী ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে, বাঙ্গলার ইতিহাসে তাহা অতুলনীয়। সমসের গাজি অতি নিঃস্ব প্রজ্ঞার বর হইতে গ্রাম্য কবির ভাষায় “ভাটী বাঙ্গলার ছানি নবাব” হইয়াছিলেন; তাহার চমকপ্রদ ইতিহাস রবিন হুডের গল্পের মত চিত্তাকর্ষক ও আশ্চর্যজনক। কিন্তু এ যাবৎ তাহা যথোচিত সংগৃহীত ও আলোচিত হয় নাই। কৈলাসচন্দ্র সিংহ-রচিত রাজমালা গ্রন্থে (পৃ. ১১৯-২৭) গাজিনামা অবলম্বন করিয়া যে বিবরণী প্রদত্ত হইয়াছে, ঐ গ্রন্থের অন্ত্যস্ত অংশের দ্বারা তাহা প্রাপ্তিপূর্ণ ও প্রমাদবহুল। ১৩২০ সনে নোয়াখালীর সিরিঙ্গাদার মোলবী লোতফল খবির সাহেব লেখ মনোহরের গান মুদ্রিত করিয়াছিলেন এবং তদবলম্বনে ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন Folk Literature of Bengal (1920) গ্রন্থে (পৃ. ১৩৬-৫০) ও বৃহৎ গ্রন্থে (পৃ. ১০৩৮-৪২) নান্দীর্ষ বিবরণী দিয়াছেন। যথোচিত যত্ন ও সাবধানতা অবলম্বিত না হওয়ায় এই সকল লেখা প্রাপ্তিপূর্ণ হইয়াছে। মুদ্রিত সংস্করণে মূল গ্রন্থের অনেক অংশ পরিত্যক্ত ও পরিবর্তিত হইয়াছে। বিশেষতঃ গ্রন্থকারের বহুতর ভণিতার মধ্যে মাত্র একটি মুদ্রিত হওয়ায় (পৃ. ৮০) এবং গ্রাম্য কবির কুলপরিচয় সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হওয়ায় গ্রন্থের কালনির্ণয় ও প্রামাণিকতা বিষয়ে ভ্রমপ্রমাদের অবকাশ সৃষ্টি করিয়াছে। সৌভাগ্যবশতঃ কৈলাসচন্দ্র সিংহের সংগৃহীত পুথির আশ্রয় ধণ্ডিত অংশ (পৃ. ১৮-১৫৪) আমাদের হস্তগত হওয়ায় এই সকল ভ্রমপ্রমাদ এখন সংশোধন করা সম্ভব। সমসের গাজি ১২ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন (১৭৪৬-৫৮ খ্রী.) এবং শেষ ৫ বৎসর (১৭৫-৫৮) বিদ্রোহীরাপে রাজ্যের অংশবিশেষ শাসন করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বের বহু প্রামাণিক বিবরণ আমরা সংগ্রহ করিয়াছি—তাহা এ প্রবন্ধের বিষয় নহে। গ্রাম্য কবি লেখ মনোহরের কিঞ্চিৎ বিবরণ মাত্র এ স্থলে প্রকাশ করিতেছি। এক স্থলে (পৃ. ১৩১-৩৩) তিনি বিজুতভাবে “নিজ করছি বিবরণ” অর্থাৎ উর্দ্ধতন বংশাবলী লিখিয়া গিয়াছেন। তৎপাঠে জানা যায়, তাঁহার উর্দ্ধতন বর্ষ পুরুষ “মাহাম্মদ নাছির” ভূম্যার তালুকদার ছিলেন। তাঁহার পৌত্র “সেক গাজি”—

ছাতিয়া ভূম্যার বেস

“দক্ষিণ সিকে” প্রবেস,

ছান কল্য “পাহুয়া” মকাম।

এই দক্ষিণশিক পরগণাই সমসেরের জন্মস্থান ও লীলাভূমি। সেক গাজির কনিষ্ঠ পুত্র “সাদক মাহাম্মদ”ই কবির পিতামহ। কবির মাতামহকুল,

“হুসনির বন্দর” ছাতি,

দক্ষিণসীকে কল্য বাড়ি,

নিবাসি উত্তর পাহুয়াতে। (পৃ. ১৩২)

কবির প্রমাতামহ “তাহির উকিল” সমসের গাজির প্রতিনিধিরূপে

ময়মুদাবাদেত রকে,

ডোমন ঘেণাম সকে,

মণাবেরে বুজায়েত দায়। (ঐ)

বহুতর ভণিতায় কবি তাঁহার তিন জন গুরু বন্দনা করিয়াছেন :—

ছৈয়দ মেহেম্মি পির, ছৈয়দ হাচন বির,

মহান্নাঙ্গ সরিক পদে । (পৃ. ১৫৪)

এক স্থলে কবি লিখিয়াছেন, তিনি নিজ পিতামহের নিকট শুনিয়া গ্রন্থের উপকরণসম্বন্ধে সংগ্রহ করিয়াছিলেন :—

কহে সেক মহুহরে পাঞ্চালি রচিয়া ।

ঐতামোহমুখে বাক্য সকল শুনিয়া ॥ (পৃ. ৮৩)

সমসের গাজি নানা স্থানে যে সকল “কারক” (কর্মচারী) নিয়োগ করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে একজন সেক মহুহরও ছিল :—

সেক মহুহরে করে মেহারকুল কাম (পৃ. ১০৩)

তিনি বর্তমান গ্রাম্য কবি নহেন—তাঁহাকে অভিন্ন ধরিয়া কেহ কেহ বিষয় ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। কবির প্রমাতামহ ও পিতামহের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নাছির মাহান্নাঙ্গ সমসের গাজির অল্পগ্রন্থভাজন ছিলেন। স্মরণ্য তাঁহার গীতিকা অমুখ্য ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হইয়া থাকিবে, তৎপূর্বে নহে। অর্থাৎ সমসেরের শোচনীয় মৃত্যুর প্রায় ৬০ বৎসর পরে ইহা রচিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থ হইতে ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করা অতীব দুষ্কর। পল্লীকবির জ্ঞানের পরিসর অতি ক্ষুদ্র ছিল। “জগৎচন্দ্র” ও কৃত্তমাণিক্য ব্যতীত অল্প কোন ত্রিপুররাজের নাম তাঁহার জ্ঞান ছিল না। সমসেরের জন্মের বহু পূর্বে দক্ষিণশিক পরগণার এক দরিদ্র ব্যক্তি “ইমন সাহেব” দৈবক্রমে মাটি খুঁড়িতে গিয়া পর্বতকোড়ে “সোনার সেওরা পায় মোতি ডোরে ডোরে” এবং এই মুক্তাখচিত শেখর মহারাজা “জগৎচন্দ্র”কে উপহার দিয়া পরগণার জমিদারী লাভ করে। বস্তুতঃ তৎকালীন ত্রিপুরাধিপতি ছিলেন কৃত্তমাণিক্য (১৬৮৫-১৭১০ খ্রী.) কিংবা তৎপূর্ববর্তী রামমাণিক্য (১৬৭৩-৮৫ খ্রী.)। ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে গ্রন্থটি এইরূপ ভ্রমপ্রসাদে পরিপূর্ণ, কিন্তু ইহাতে পারিবারিক এবং স্থানীয় যে সকল ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা রহিয়াছে, তাহার মূল্য উপেক্ষণীয় নহে। পল্লীকবির রচনার নিদর্শনস্বরূপ সমসের-নির্মিত ‘মুতিধরে’র (মুক্তাগারের) বর্ণনার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল।

একাবলি ছন্দ

এক তোলা ঘরসোভা । মুনীগণ মোনসোভা ॥

জেছেন অমরাপুরি । সভানের মোনহারি ॥

দেখিতে নিরাছন্দা । জেন সত চন্দ্র বান্দা ॥

খলকে তারকগণ । চারি পালে অভরণ ॥

সেই সে ঘরের স্বরা । শুভিত মুতির ছরা ॥

জেছেন চামর ধোলে । সুবর্ণ মুতির জলে ॥

বিশু বিশ্ব বারি মোহে । ঐশ্বর উষ নাহি রহে ॥

আমলে পুলকে চিত । কামের সবাবে নিত ॥

জুগন্ধি চামর তায় । নিতি ভৎসে কামরায় ॥
 অকের সাগরে মন । নিতি প্রতি করে ধান ॥
 আনন্দ সানন্দ মম । জেন শ্রিয়ন্মাবন ॥
 রাধিকার কোরে কাছ । জেন বৈসে জোপভাছ ॥ (পৃ. ১০৭)

৪। চম্পকবিজয়

১৩৪০ সনে এই গ্রন্থের একটা আধুনিক প্রতিলিপি ত্রিপুররাজধানী আগরতলার রাজগ্রন্থাগারে রক্ষিত মূল্যবান গ্রন্থরাজির মধ্যে পাইয়া আমরা পাঠ করিয়া দেখিয়াছি। এই গ্রন্থের বিস্তৃত ঐতিহাসিক রচনা ‘রাজমালা’ কিম্বা ‘রুক্মমালা’কেও নিশ্চিত করিয়া দেয়। ত্রিপুরাধিপতি মহারাজ দ্বিতীয় রত্নমাণিক্যের (১৬৮৫-১৭১০ খ্রী.) রাজত্বের প্রথম দশ বৎসরের ঘটনাবলী ইহাতে যথাযথ বিবৃত হইয়াছে—কবিজনশ্রুত অতীতি কিম্বা অতিরঞ্জন একান্তভাবে বর্জিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতিপাদ্য প্রধান ঘটনা হইল রাজা নরেন্দ্রমাণিক্যের বিদ্রোহ ও রত্নমাণিক্যের সাময়িক রাজ্যচ্যুতি (১৬৯০-৯৪ খ্রী.)। যে সকল প্রধান সেনাপতি ও রাজপুরুষের সাহায্যে রত্নমাণিক্য রাজ্য পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন “শ্রীমির খাঁ গাজি” এবং তাঁহার একজন পারিষদ “সেখ মহদি” তাঁহারই আদেশে এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। দুইটা ভণিতা উদ্ধৃত হইল :—

হীন মহদিয়ে কহে মিরখাঁ আদেশে ।

সমসের ভারত পুঁথি রচিল বিশেষে ॥ (পৃ. ১২)

শ্রীযুত মিরখাঁ প্রতাপে ভাঙ্কর ।

কহে হীন মহদিয়ে তান আছাপর ॥ (পৃ. ৬১)

এই গ্রন্থ রত্নমাণিক্যের রাজত্বকালেই রচিত হইয়াছিল। যথা,

শ্রীরত্নমাণিক্য রাজা গুণে অমুপাম ।

তান পদতলে করি সহস্র প্রণাম ॥ (পৃ. ৬)

সুতরাং ইহা একখানি অপূর্ব সমসাময়িক ঐতিহাসিক কাব্য। যে কারণে এই গ্রন্থের নাম “চম্পকবিজয়” রাখা হইয়াছে, তাহার রহস্য উদ্ঘাটন করা আবশ্যক। এই গ্রন্থানুসারে মাত্র ৫ বৎসর বয়সে শিশু রত্নদেবকে সিংহাসনে বসাইয়া তাঁহার মাতুল বলিভীমনারায়ণ “সুবরাজ” হইলেন। রত্নদেবের বয়স্ক (বৈবাহিক) ভ্রাতা অমরসিংহ, শত্রুসিংহনারায়ণ প্রভৃতিকে বলিভীম পূর্বেই হত্যা করিয়াছিলেন। অত্যাচারী বলিভীমের অধিকারকালে রাজবংশীয়গণ পলায়নপূর্বক আশ্রয়লাভ করিয়াছিল। তন্মধ্যে প্রধান ছিলেন রত্নদেবের পিতৃব্য জগন্নাথ-পুত্র “চম্পকরায়”—সে কালে চম্পকরায় আছিল লুকাই। (পৃ. ২০)

গ্রন্থের প্রথম ভাগে বলিভীমের পতন পর্যন্ত বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে—“ইতি চম্পকবিজয়ে বলিভীমনারায়ণ বন্দিঃ” (পৃ. ৬৩)। ঢাকা হইতে—

শাস্তা খাঁ নবাব যদি তৈঙ্গির হইল ।

খান বাহাদুর তবে বাদশাহতে আইল ॥

সর্বদেশের জমিদার আসিয়া মিলিল ।

ত্রিপুরনৃপতি তবে গরবাক্ষির হৈল ॥ (পৃ. ২৩)

‘পঞ্চশত অশ্ববার সংহতি করিয়া’ লাল্য কেশবদাস নামক সেনাপতি ত্রিপুরা আক্রমণ করে এবং বলিভীমের সকল চক্রান্ত ব্যর্থ হইয়া অবশেষে “সংরাইলের গড়” হইতে তিনি খৃত হন — “মস্ত গজে ধরি যেন সিংহ লইয়া যায়” (পৃ. ৫৯) ।

বলিভীম চলি গেল সাহা বিভ্রম ।

অপরোধি জানিয়া হৈল মুসলমান ॥ (পৃ. ৬২)

দ্বিতীয় ভাগে রত্নমাণিক্যের রাজ্যশ্রষ্ট হওয়ার বিবৃত্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে । বলিভীমের নিকাগনের পর, “জগন্নাথের বংশ সব হইল প্রধান” (পৃ. ৬৪) । সূর্য্যপ্রতাপনারায়ণ উজির হইল এবং “দেওয়ান মুনসী হইল চাম্পা রায় ঠাকুর” (পৃ. ৬৭) । এই সময়েই,

মিরখারে আনি তবে উকিল করিল ।

মোগল বুঝাইতে তবে তানে নিয়োজিল ॥

রত্নমাণিক্যের পিতৃব্যপুত্র “দারিকা ঠাকুর” রামমাণিক্যের রাজত্বকালেই কিছু দিনের জন্ত বিজোহী হইয়া “নরেন্দ্রমাণিক্য” নামে রাজ্য হইয়া বসিয়াছিলেন । তিনি এইবার নানারূপ চক্রান্ত করিয়া “রাজা দলসিংহ” নামক রাজপুরুষের সাহায্য লাভ করিয়া পুনঃ রাজ্য হওয়ার চেষ্টায় রহিলেন । ইতিমধ্যে, “খান বিরাহিম হৈল বড় অধিপতি” (পৃ. ৮৬) এবং নরেন্দ্রদেব উজীর ও নেব উজীরকে গোপনে হত্যা করাইয়া দলসিংহের রাজপুত্র সৈয়দ সৈয়দ মেহেরকুলের পথে ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া রাজধানী উদয়পুর অধিকার করেন এবং দ্বিতীয় বার রাজ্য হইয়া বসেন । রত্নমাণিক্য, চম্পক রায় প্রভৃতি দ্বারা পরিরক্ষিত হইয়া অরণ্যে আশ্রয় লইয়াছিলেন ।

তৃতীয় ও চতুর্থ ভাগে রাজ্যোদ্ধারের চেষ্টা এবং চম্পক রায়ের পরিক্রমকাহিনী সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে । রত্নমাণিক্যের প্রধান সেনাপতি ইমিল খাঁ প্রভৃতি, চাকায় মীর খাঁ ও কুমার চুর্জয়সিংহনারায়ণের (যিনি পরে ষষ্ঠমাণিক্য নামে রাজ্য হইয়াছিলেন) সহিত মিলিত হইয়া পরামর্শ করিতে লাগিলেন । ইতিমধ্যে চম্পকরায় ও অনন্তরাম দুই জনে চাটগ্রামে সেখ সাহাদি নামক এক ফকিরের আশ্রয়ে দীনভাবে কালযাপন করিয়া, ভুলিয়া হইয়া চাকায় আসিলেন । সেখানে সকলের সমবেত চেষ্টায় এবং “হীরানন্দমুখ ত্রিযুত মাণিক্যসাহা”র (অর্থাৎ জগৎশ্রষ্ট মাণিক্যচাঁদের) অর্থসাহায্যে (পৃ. ১৭৭-৮) যুদ্ধের আয়োজন সম্পূর্ণ হয় । নরেন্দ্রমাণিক্যের আত্মরক্ষার্থ বিপুল আয়োজনের বর্ণনামধ্যে গ্রন্থখানির আবিষ্কৃত প্রতিজ্ঞা হঠাৎ শেষ হইয়াছে । সৌভাগ্যক্রমে গ্রন্থারম্ভে বিষয়সূচি হইতে অবশিষ্ট অংশের মূল সূত্র প্রাপ্ত হওয়া যায় । রত্নমাণিক্য পুনঃ রাজ্যপ্রাপ্ত হইলে

মহাসম্রাট চম্পক রায় হইল সুবরাজ ।

অনন্তরাম উজির হইল পাইল রাজকাজ ॥ (পৃ. ১৭)

ইহরচনাকালে চম্পকরায়ই রাজ্যের প্রধান রাজপুরুষ ছিলেন; তাঁহার এবং কবির উষ্ট্রপোষক

যশবন্ত রসকীর্ষি সাহা মির খাঁন ।

চম্পক রায়ের প্রিয় প্রাণের সমান ॥ (পৃ. ৩৪)

ঐভয়েরই প্রচুর প্রশংসা গ্রন্থের নানা স্থানে পাওয়া যায় ।

তজবিজ্ঞ দিয়াছে এডু চম্পক রায় পরে ॥

জগন্নাথনুত যদি যুবরাজ না হৈত ॥

রাজার রাজ্যের পরে অনর্থ পড়িত ॥ (পৃ. ৯)

সুতরাং কবি তাঁহার নামানুসারেই কাব্যের নাম রাখিয়াছেন “চম্পকবিজয়” । চতুর্থ ভাগের শেষ যথা:—

চম্পকবিজয় কথা মধুরসবাণী ।

সেক লক্ষ্মিরে কহে যুদ্ধের কাহিনী ॥

এ ছেন অপূর্ব কথ্য শুনে যেই জনে ।

বুজি সাহস তার বাস্তবে সেই ক্ষণে ॥

মূল পুথির শেষে ছিল—“পুস্তক শ্রীরামজয় ঠাকুর স্বাক্ষর শ্রীরামনারায়ণ দেব...সন ১২০৬ তারিখ ১৮ই বৈশাখ ।” (এখানে উল্লেখযোগ্য, পরিষদের রাজমালা পুথির লেখকও এই “রামনারায়ণ দেব”—৪৯২ ও ৫৫২ পত্র দৃষ্টব্য) ।

এই গ্রন্থে সত্রাটী আওরঙ্গজেবের রাজত্বের শেষ ভাগে বঙ্গের তৎকালীন রাজধানী ঢাকা নগরীর কথা প্রসঙ্গক্রমে বহু স্থলে উল্লিখিত হইয়াছে এবং রাজনীতির তাৎকালিক একটা অবিকল চিত্র ইহাতে অঙ্কিত পাওয়া যায় । নরেন্দ্রমাণিক্যের বিদ্রোহের প্রকৃত বিবরণ ও কালনির্ণয় (ইব্রাহিম খাঁর অধিকার ১৬৯০-৯৭ খ্রী. মধ্যে) এই প্রামাণিক গ্রন্থে আবিষ্কৃত হওয়ায় বহু ভ্রান্ত মত সংশোধিত হয় এবং নরেন্দ্রমাণিক্যের অভিষেকযুদ্ধের দ্বারা তাহা সম্পূর্ণ সমর্থিত হয় । চট্টগ্রামে চাকমা রাজবাড়ীতে একটি স্তূর্ণ-মুদ্রা আমরা পরীক্ষা করিয়াছিলাম—এক দিকে লেখা “হরিহরপদপদ্মমধুপ / শ্রীশ্রীযুত নরেন্দ্রমাণিক্যদেব” এবং অপর দিকে “শক ১৬১৫” (= ১৬৯৩ খ্রী.) । চম্পকবিজয়ে ত্রিপুরার বহুতর দুর্গ ও গড়ের উল্লেখ দৃষ্ট হয় । ত্রিপুরা আক্রমণের দুইটি পথই প্রাচীন কাল হইতে পরিচিত ছিল—মেহেরকুলের পথ ও কৈলাগড়ের পথ । এ গ্রন্থে দক্ষিণ দিকে চৌদ্দগ্রামের পথ নূতন দৃষ্ট হয়—এই পথ ধরিয়াই মির খাঁ বুহুদার ভেদ করিয়া উদয়পুর নিয়াছিল (পৃ. ১৩) ।

রজমাণিক্যের অভিষেকযুদ্ধের শকাব্দ ১৬০৭ এবং ঐ শকাব্দেই তিনি তান্ত্রশাসনদ্বারা ভূমিদান করিয়াছিলেন—এই তান্ত্রপট্ট আমরা পরীক্ষা করিয়াছি । তৎকালে ঢাকায় সারেন্তা খাঁর অধিকার ছিল । বলিভীমের পতন হয় বাহাদুর খাঁর সময়ে (১৬৮৮-৯০ খ্রী:)—এ স্থলে দুর্গামণির রাজমালা (পৃ. ২৯৩) সংশোধনীয় । নরেন্দ্রমাণিক্যের রাজত্ব ২ বৎসরের বেশী স্থায়ী হয় নাই—১৬৯৫ খ্রী: রজমাণিক্যই রাজা ছিলেন প্রমাণ আছে । সুতরাং বলিভীমের পতন ১৬৮৯ খ্রী: হইতে অন্তত: ১৭০৬ খ্রী: পর্যন্ত দীর্ঘ ১৫ বৎসর চম্পক রায়ই ত্রিপুরারাজ্যের প্রকৃত শাসনকর্তা ছিলেন ।

চম্পক রায়ের শৌচনীর পতনের কথা দুর্গামণির রাজমালায় (পৃ. ২২৬) নাই আমরা প্রাচীন রাজমালা হইতে তাহা লিখিতেছি। তিনি বুদ্ধিলব্ধ হইয়া স্বয়ং রাজা হইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু সৈন্যসকল রত্নমাণিক্যের পক্ষে থাকায় তিনি নিহত হন :—

বিধাতা বিপক্ষ হৈলে বোধি হইল নাথ ।
রাজা হইতে মনে তার হইল প্রত্যাণ ।
রাজসভা সব জ্ঞাত রাজ্যবিগে হইল ।
ইসব দেখিয়া তবে চিন্তাভুক্ত হইল ।
জ্ঞাত সব পরিবার রাণীরা দেসেতে ।
প্রাণভয় পলাইয়া গেলেক বনেতে ।
রাজসভা বন হতে ধরিয়া আনিল ।
অপরূপ জানি তারে সংহার করিল ॥ (৬১২ পত্র)

চম্পক রায় প্রকৃতই যে রাজা হইতে চাহিয়াছিলেন অথবা কিসকাল রাজা হইয়াছিলেন, তাহার বিস্ময়কর একটি প্রমাণ আমাদের হস্তগত হইয়াছে। চম্পকবিজয়ের প্রারম্ভে লিখিত আছে :—

লক্ষ হোম পূজা যে করিল মহামতি ।
আপনে আসিয়া ব্রহ্মা দিলেক আহতি ॥
তুষ্ট হইয়া বর তবে দিল ভদ্রময় ।
সর্বত্র কল্যাণ হৈব রিপু হোক ক্ষয় ॥ (পৃ. ১১)

এতদ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায়, চম্পক রায় উক্তমতে লক্ষ হোম সম্পাদন করিয়াছিলেন। এবং অনুমান করা যায়, ইহা রাজ্যলাভ প্রত্যাশার ফলেই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দর কাব্যের কালীপক্ষীর চীকার একটি পুঁথি আমরা সংগ্রহ করিয়াছি। রচয়িতার পরিচয়াদি শেষ পত্র (১০০) হইতে উদ্ধৃত হইল।

আন্তে ত্রীশুগপলী সুরবরসরিংগীমদেধে সুব্রত
তত্র ত্রীগৌরুধাণ্যো নিবসতি সততং দণ্ডিনামগ্রগণ্যঃ ।
তচ্ছাভ্রশ্চন্দ্রচূড়-স্তুপূরনরপতিং ত্রীযুতং চম্পকাখ্যং
দৈবাং তদৈক্যত্যাগীকান্তমহুতিবশাং ব্যাঘ্রচং ব্রহ্মচারী ॥
মহাভূপকল্যাণদেবস্ত পৌত্রং, সূতং সঙ্কগদাধবীরস্ত বীরং ।
গুরোর্বাসরে মাসি মাষে চ বস্ত্রে, শক্রে সঙ্কযুগ্মসি-রাজীশপণ্যে ॥ (কুলকং)

তৎপর তিনটি প্রশস্তি-শ্লোকে গ্রন্থসমাপ্তির পর পুঁথিকা যথা,

ইতি ত্রীযুতমহারাজাধিরাজচম্পকমহীনাথ-নিদেশিত-ত্রীচন্দ্রচূড়-
ব্রহ্মচারিবিরচিতা কালীপক্ষীয়া বিদ্যাসুন্দরকাব্যটীকা সংপূর্ণা ॥০॥
শকাব্দাঃ ১৬২৭ ॥ ত্রী × × দাসশর্দূপঃ স্বাক্ষরং পুস্তকঞ্চ ষ্ট হরিঃ ॥

এই লেখা হইতে সন্দেহ থাকে না যে, চম্পক রায় বোরতর শাস্ত ছিলেন এবং ১৬২৭ শকাব্দের মাঘ মাসে (১৭০৬ খ্রিঃ) “মহারাজাধিরাজ” উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। ঐ সনেই তাহার নিধন ঘটিয়াছিল ধরা যায় এবং চম্পকবিজয়ের রচনাকাল অব্যবহিত পূর্বে ১৭০৫ খ্রীষ্টাব্দে অনুমান করা যায়।

ঐতিহাসিক রাজনারায়ণ

ঐচ্ছিকচরিত্র চক্রবর্তী

‘পুথির শেষ কথা’ প্রবন্ধে (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৫৭শ ভাগ, পৃ. ৫২-৫৮) বলিয়াছিলেন—‘লেখক বা মালিক হিসাবে পুথির মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম পাওয়া যায়।...বিত্তি স্থান হইতে বিভিন্ন পুথির সন্ধান করিয়া যেমন একজন গ্রন্থকারের পূর্ণ পরিচয় সংকলিত হয়, সেইরূপ ভাবে এক এক জন সংগ্রহকারীর সংগ্রহেরও বিস্তৃত বিবরণ সংকলিত হইতে পারে এবং অনেক অজ্ঞাত পুথিশালার সন্ধান মিলিতে পারে।’ এতদ্ব্যতীত এইরূপ একজন বিশিষ্ট পুথির মালিক ও তাঁহার কয়েকখানি পুথির সম্বন্ধে কিছু বলিতেছি। তাঁহার পূর্ণ পরিচয় ও তাঁহার পুথিশালার সন্ধান ইহা অণুমাত্র সহায়তা করিলে সূখী হইব।

বহুর কুড়ি পূর্বে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মেদিনীপুর-শাখার বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষ্যে মেদিনীপুরে বাইয়া, শাখা কতৃক সংগৃহীত পুথিগুলি নাড়াচাড়া করিতে করিতে রাজনারায়ণ নামক স্থানীয় এক ভূস্বামীর চারিখানি পুথির প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। মূল-পরিষদের প্রধান কর্মচারী সন্তঃ পরলোকগত মুহম্মদ রামকমল সিংহ মহাশয়ের সহযোগিতায় পুথিগুলির শেবাংশ টুকিয়া লই। পুথিগুলি সবই সংস্কৃত পুরাণশাস্ত্রের। প্রতি পুথির শেষের দিকে লেখক নিজের নাম উল্লেখ করিয়াছেন—পরিচয় বিশেষ কিছু দেন নাই। এইটুকু মাত্র জানা যায় যে, তিনি পুথির স্বত্বাধিকারী রাজনারায়ণের সত্যসদ এবং একজন কবি ছিলেন—তাঁহার নাম ছিল রঘুনাথ দেবশর্মা। তবে তাঁহার কবিত্বের বা পাণ্ডিত্যের কোন নিদর্শন পুথির মধ্যে নাই। পুথি কয়খানির নকলের তারিখ ১৬৯৮, ১৬৯৯ ও ১৭০৫ শকাব্দ অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদের গোড়ার দিক। গ্রন্থাধিকারীকে বিবিধ বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে। যথা, মহারাজাধিরাজ, প্রবল-প্রতাপাশ্রিত রাজাধিরাজ, দোর্দণ্ডপ্রবলপ্রতাপপরম, রাজনীতিবিদ, শিবভূগাপরায়ণ, মহাদেবপ্রিয়। সত্যসদের ব্যবহৃত বিশেষণের মধ্যে কতটুকু বাস্তব, কতটুকু অতিরঞ্জন, নির্ণয় করা অসম্ভব। তবে রাজনারায়ণ যে একজন শক্তিশালী জমিদার ছিলেন, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই।* হয় ত তাঁহার শাস্তাধ্বরাগ ছিল এবং পুথি নকল করাইয়া সংগ্রহ করার দিকেও একটা ঝোঁক ছিল। তবে তাহা কেবল কয়েকখানি পুরাণ-গ্রন্থের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল কি না, বলিবার উপায় নাই।

* ইনি ও মেদিনীপুরের অন্তর্গত কাপীজোড়ার ‘রামভূলা রাজা’ রাজনারায়ণ অভিন্ন ব্যক্তি হইতে পারেন। রাজা রাজনারায়ণের সত্যসদ নিত্যানন্দ স্মরণিত শীতলাবজল কাব্যে পৃষ্ঠপোষকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন (ঐআত্তোষ ভট্টাচার্য, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস—দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ৬৬৭)।

পুথিগুলিতে লেখক, লেখনকাল ও গ্রন্থাধিকারী সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, এইবার অবিকল তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

১। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ—ব্রহ্মখণ্ড—৩০ অধ্যায়।

যজ্ঞার্থে লিখিতং চেনং পুরাণং শিবসুন্দরি।
তস্মৈ দেহস্তু গেহস্তু নিত্যং ভবতু মঙ্গলম্ ॥
দোৰ্দ্ধিওপ্রবলপ্রতাপপরমশ্রীরাজনারায়ণশ্চৈব
শ্রীমহাশয়স্তু মহতো গ্রন্থোহতিভব্যপ্রদঃ।
ব্যালেশি রঘুনাথনামকবিনা ভো ব্রহ্মখণ্ডো মুদা
বিপ্রৈশ প্রথমে দিনেহপি দশমাসস্তু প্রযত্নাদ্রুতম্ ॥
নাগার্জুনশশাঙ্কেশুশাকে মাসি তপাধ্যকে
দ্বিতীয়ায়াম্ শনৌ শুক্রে শ্রবণায়াম্ সমাপনম্।
অনুকযোগে দিবা যুগ্মপ্রহরাভ্যন্তরেধুনা
মেদিত্যাকং স্থিতিং কৃত্বা লিখনন্তু সশোভনম্ ॥

২। প্রকৃতিখণ্ড—৬৩ অধ্যায়।

শ্রীমচ্ছিবজুর্গাপরায়ণপ্রবলপ্রতাপাশ্বিতরাজাধিরাজশ্রীরাজনারায়ণমহাশয়স্তু পুস্তকমিদম্।
তৎসভাসদাশ্চেন শ্রীরঘুনাথদেবশর্মা লিপিরয়ম্।

শাকে নাগাক্ষবটচন্দ্রে মধুমােসেহসিতে শুরৌ
শিবজুর্গাপ্রসাদেন লিখনন্তু সমাপনম্।
যজ্ঞার্থে লিখিতং জুর্গে পুরাণং স্তম্বরং শুভং
তজ্ঞাপত্যস্তু গেহস্তু নিত্যং ভবতু মঙ্গলম্ ॥

৩। গণেশখণ্ড—৪৭ অধ্যায়।

মহারাজাধিরাজস্তু মহাদেবপ্রিয়স্তু চ
মহারাজস্তু শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণস্তু চ।
বিশ্বনিয়করঃ খণ্ডো গণেশস্তু প্রিয়স্তুতঃ
ব্যালেশি রঘুনাথেন দ্বিজেন চপলং মুদা ॥
শকাব্দা ১৬৯৯ ॥ ২। ১৪ ॥

৪। বৃহন্নারদীয় পুরাণ—

রাজনীতিবিদঃ শ্রীল রাজনারায়ণস্তু চ।
পুরাণং নারদীয়াখ্যং লিখিতং রঘুশর্মা ॥
শকাব্দা ১৭০৫ তাং ১৪ আশ্বিনস্তু।

একখানি মনুষ্যবিক্রয়পত্র

ত্রিচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

পুরাণ বাংলায় বিচিত্র ধরণের যে সব দলিলপত্র পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে কিশিদধিক এক শত বৎসর হইতে সোয়া দুই শত বৎসর পূর্বের মনুষ্যবিক্রয়পত্রগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য^১। ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পঞ্জিকায় প্রকাশিত ও কিছু কিছু আলোচিত হইয়াছে। তবে সামগ্রিক ভাবে ইহাদের সম্বন্ধে তেমন কোন আলোচনা এখন পর্যন্ত হয় নাই। অথচ ইহাদের মধ্যে সামাজিক ইতিহাসের অনেক মূল্যবান ও কৌতুককর উপাদান বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। এইগুলি হইতে আমরা জানিতে পারি—মানুষ স্বপ্নের দ্বারে বা ছুঁতিক্ষের চাপে অস্বাভাবে নিজেকে একক বা সপরিবারে, নিজ পুত্র কন্যা দাস দাসীকে অপ্রত্যাশিত স্বল্প মূল্যে চিরদিনের জন্য বা দীর্ঘ মেয়াদে বিক্রয় করিয়াছে—ক্রেতার দাস-পুত্রের সহিত বিবাহের উদ্দেশ্যে কেহ কেহ নিজের দাস-কন্যা বিক্রয় করিয়াছে। দ্রব্যবিনিময়ে বিক্রীতের মুক্তির সতের উল্লেখ কোন কোন দলিলে পাওয়া যায়। আলোচনার সুবিধার জন্য আমার জ্ঞাত প্রকাশিত দলিলগুলির একটি কালামুক্রমিক বিবরণযুক্ত তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

ক্রমিক সংখ্যা (বঙ্গাব্দ)	তারিখ	বিষয়বিবরণ	বিক্রয়মূল্য ^২	প্রকাশ-স্থান
১।	১১২৫	এগার বৎসরের কন্যা ^৩ বিক্রয়	৩	শিবরতন মিশ্রকৃত Types of Early Bengali Prose, পৃঃ ৮৬
২।	১১৩৩	আম্রবিক্রয় (স্বামী, স্ত্রী ও এক পুত্র)	২১	যোগেন্দ্রনাথ শুধুকৃত বিক্রয়পুরের ইতিহাস, (১ম সং), পৃঃ ৩২৮

১। এই প্রসঙ্গে দুইখানি ভ্রমপত্র (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩০৬, পৃ. ২৩৭-৩০১; ১৩০৮, পৃ. ৮-১০) একখানি শালগ্রাম বস্তুর দলিল (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৪০, পৃ. ৪০) ও একখানি পিরুতর গয়েরও (ভারতবর্ষ, পৌষ ১৩০৫, পৃ. ২০) উল্লেখ করা হইতে পারে।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত আসামে দাস ক্রয়-বিক্রয়প্রথা বহুল প্রচলিত ছিল। উচ্চ জাতির বয়স্ক পুরুষের মূল্য ত্রিটি টাকা হইতে নিম্নশ্রেণীর বালিকার মূল্য তিন টাকা পর্যন্ত ছিল [গেট—A History of Assam, পৃ. ২৩২], অথচ রূপকথা পাঠে জানা যায়, রাজকুমারী লক্ষ টাকা দিয়া কাকনমালাকে ক্রয় করিয়াছিলেন (Eastern Bengal Ballads—II. ২, পৃ. ১০১।

২। লক্ষ্য করিতে হইবে যে, বিভিন্ন দলিলে বিভিন্ন ধরণের মুদ্রা ও তাহার আদানপ্রদানপদ্ধতি উল্লিখিত হইয়াছে—পুরণজন (৫, ৭, ১০), মান্দ্রাজী তত্ত্বা (৪), সিদ্ধা (১২, ১৩, ১৪), বোয়াজি বা বেওয়াজি (১, ১০)। কোন কোন দলিলে আবার বিশেষ কোন ধরণের উল্লেখ নাই।

৩। মেয়াদ ৭০ বৎসর। দশ মণ তামা দিলে পূর্বে খালাস পাইবার সত উল্লিখিত হইয়াছে।

ক্রমিক সংখ্যা	তারিখ (বঙ্গাব্দ)	বিষয়বিবরণ	বিক্রয়মূল্য	প্রকাশ-স্থান
৩।	১১৩৪	আত্মবিক্রয় (স্বামী, জ্ঞী, পুত্র কল্পা চারিটি)	১১	মিত্র—Types...পৃ: ৮৮
৪।	১১৪২	আট বৎসরের পুত্র বিক্রয়	৭	প্রবর্তক (১৩২৮, ফাল্গুন পৃ: ৮২-৯৭)।
৫।	১১৬১	আত্মবিক্রয় (পাঁচ জনের পরিবার)	২১	মিত্র—Types...পৃ: ৮৮
৬।	১১৭৭	আত্মবিক্রয়		ঐ, পৃ: ৮৯
৭।	১১৯১	আত্মবিক্রয় (দুই জন জীলোক ও দুইটি শিশু)	২৫	ষোগেন্দ্র গুপ্ত—বিক্রম- পুরের ইতিহাস, পৃ: ৩২৮
৮।	১১৯৫	কল্পা সহ মাতার আত্মবিক্রয়*	৩	সাহিত্য (১৩২০, ভাদ্র, পৃ: ৪৩৫-৪১)
৯।	১১৯৫ (?)	দুর্ভিক্ষজন্তু নিজ কীর্তনদাসকে বিক্রয়	১২	প্রবাসী (১৩২৯, জ্যৈষ্ঠ, পৃ: ১৮৭-৯০)
১০।	১১৯৭	ছয় বৎসরের কল্পা বিক্রয়	৩	মিত্র—Types...পৃ: ৮৭
১১।	১২১২	বিবাহোদ্দেশে দাসকল্পা বিক্রয়	৩	মিত্র—Types...পৃ: ১০১
১২।	১২২৬	বার বৎসরের দাসীকল্পা বিক্রয়	৪৫	ভারতবর্ষ (১৩৩৭, বৈশাখ, পৃ: ৮৪২)
১৩।	১২৪২	পঁচিশ বৎসরের পুরুষের আত্মবিক্রয়	১৬	মিত্র—Types...পৃ: ১১১
১৪।	১২৪৩	বিবাহোদ্দেশে দাসীকল্পা বিক্রয়	১৬ + ১৫০	ঐ পৃ: ১১২

কিছু দিন পূর্বে আমি একখানি সংস্কৃত পুথির মধ্যে পুথির পত্রাকারে পত্রের অর্ধাংশে লিখিত একখানি মনুষ্যবিক্রয়পত্র পাইয়াছি*। ইহাতে ১১৭৭ বঙ্গাব্দে ষণ পরিশোধার্থ পঞ্চত্রিংশ বর্ষবয়স্কা বিনী দাসীর পনের টাকায় আত্মবিক্রয়ের কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। দলিলের নকল প্রকাশ করিতেছি :—

৪। মেসাদ ৭০ বৎসর। সোয়া মণ হলুদের সিধা দিয়া মুক্ত হইতে পারিবে।

৫। মূল দলিলখানি বতমানে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চিত্রশালায় রক্ষিত আছে।

৬। পুথির মধ্যে নানা প্রয়োজনীয় কাগজপত্র রাখিয়া দেওয়া হইত। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের একখানি পুথির মধ্যে প্রাপ্ত শালগ্রাম বৎসকের দলিল ইতঃপূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে (পরিষৎ-পত্রিকা—১৩৪০, পৃ. ৪০)। আলোচ্য দলিলখানি বতমানে পরিষদের চিত্রশালায় আছে।

ইয়াদি আশ্ববিজ্ঞপত্রমিদং শ্রীনীলকণ্ঠ সার্বভৌম মহাশয়েষু [১] শ্রীবিনী দাসী ধনিরাম দেএর শ্রী যোগিরাম মাধবির কন্যা রয়স ৩৫ পাঁচ তিস বৎসর কন্যা লিখনং আগে [১] আমার শ্রীজয়নারায়ণের মারফৎ কর্ত্ত্ব মহাজনের ১৫ পণর রূপাইয়া ছিল [১] এ বিধায় স্বগাম্ উপহতি এ' নগদ মূল্য পাঁচ মিল দশমাসী পুরোজন ১৫ পণর রূপাইয়া পাইয়া আপন স্বৈচ্ছায় মহাশয়ের স্থানে আশ্ববিজ্ঞপত্র হইয়া শ্রীজয়নারায়ণের মারফৎ আদায় মহাজনের হইলাম [১] লগুয়াজীমা ধোরাক পোষাক দিয়া দানবিক্রেয়ধিকারী হইয়া পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে দাসীকর্ম করাইতে রহ [১] ইতি সন ১১৭৭ সাৎসম্বৈর বাংগলা সন ৫৬৮ পাচ সয় আটবৈষ্ট তে ৭ সাতৈ জ্যৈষ্ঠ :

ডান দিকের উদ্ধ-কোণে

শ্রীজয়নারায়ণ

ডান পাশে

শ্রীজয়নারায়ণ

উলটা পিঠে

ইশাদি

শ্রীরাম রায়

শর্ম্মা

শ্রীলক্ষ্মীকান্ত

শর্ম্মা সাঁ চন্দ্রদ্বীপ :

শ্রীগঙ্গাপ্রসাদ

শর্ম্মা সাঁ কার্ত্তিকপুর

শ্রীজয়নারায়ণ

দেব সাঁ টংগিবাড়ী

শ্রীহরিহর

শর্ম্মা ঘটক :

৭। অন্ন রিণ উপহতিক্রমে—পূর্বের তালিকার ৩৩৫ সংখ্যক দলিল। অনা'ও রিণ উপহতি—তালিকার ২ সংখ্যক দলিল। অন্ন'রিণ উপহতিক্রমে—তালিকার ১২ সংখ্যক দলিলের মূল।

৮। পুরোজন দহমাসী—পূর্বের তালিকার ৫, ৭ ও ৯ সংখ্যক দলিল। পুরোজন সহ দাসী—তালিকার ১০ সংখ্যক দলিল। পুরোজন দহমাসী—তালিকার ৮ সংখ্যক দলিল।

৯। পরগণাতি সন—পূর্বের তালিকার ২ সংখ্যক দলিল। এই সন সম্বন্ধে আলোচনা—আনন্দলাল রায়, 'ভারতবর্ষ', কার্ত্তিক ১৩২১, পৃ: ৭৭২-৮১।

বাংলা সাময়িক-পত্র

১২৯১-১২৯৪ সাল (এপ্রিল ১৮৮৪—এপ্রিল ১৮৮৮)

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১২৭৫ হইতে ১২৯০ সালের মধ্যে যে-সকল বাংলা পত্র-পত্রিকা জন্মলাভ করিয়াছিল; ৫৪শ ৫৭শ বর্ষের পরিষৎ-পত্রিকায় সেগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি।* এক্ষণে পরবর্তী দশ বৎসরে (১২৯১-১৩০০) যে-সকল বাংলা সাময়িক-পত্রের আবির্ভাব ঘটে, সংক্ষেপে সেগুলির পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব। উপযুক্ত উপকরণের অভাবে এই বিবরণে হয়ত অসম্পূর্ণতা লক্ষিত হইবে, ভবুও বহু কষ্টে যেটুকু সংগ্রহ করিতে পারা গিয়াছে, তাহা প্রকাশ করিয়া দেওয়া ভাল।

বৌদ্ধ বন্ধু (মাসিক)। বৈশাখ ১২৯১ (এপ্রিল ১৮৮৪)।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী—কালীকিঙ্কর মুৎসুদী। পরমায়ু—এক বৎসর। ধর্ম, শিক্ষা ও সমাজের উন্নতি সাধনই ইহার উদ্দেশ্য ছিল।

“১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে স্বদেশহিতৈষী কর্মবীর স্বর্গীয় কৃষ্ণচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের চেষ্টায় ইহা পুনঃপ্রচারিত হয়। তাঁহার আদেশে কালীকিঙ্কর বাবু সে সময়েও উহার সম্পাদকত্ব গ্রহণ করেন এবং তিনি নিজে উহার স্বত্বাধিকারী ছিলেন। উক্ত বৎসর নবেম্বর মাসে কোনও সরকারী কার্যে নিযুক্ত হইয়া কালীকিঙ্কর বাবু পদত্যাগ করিলে ৮কৃষ্ণ বাবু নিজেই ইহার সম্পাদনভার গ্রহণ করেন। তাঁহার সম্পাদকত্বে বৎসরাবধি ‘বৌদ্ধ বন্ধু’ প্রকাশিত হইলে পর আবার তাহার প্রচার বন্ধ হইয়া যায়।...১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের আশ্বিন মাসে চট্টগ্রাম বৌদ্ধ সমিতির সম্পাদক ভাস্কর ৮ভগ্নীরথ বড়ুয়ার উদ্যোগে আর এক বার ‘বৌদ্ধ বন্ধু’ সাধারণের নিকট প্রকাশিত হইয়াছিল। কিঞ্চিদধিক এক বৎসর কাল প্রকাশিত হওয়ার পর কার্যকারকের অভাবে সে বারেও ইহার প্রচার বন্ধ হইয়া যায়।”

* ১২৯০ সালের বিবরণে আমরা তিনখানি পত্রিকার নামোল্লেখ করিতে জুলিয়াছি; উহা :—

ত্বনীতি (পাক্ষিক)। ১ কার্তিক ১৮০৫ শক।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন (কৃষ্ণানন্দ বামী)-প্রতিষ্ঠিত ‘ধর্মপ্রচারক’ পত্রের আশ্রয়ে ও বারাদশী হুনীতিসংগঠিত সভার উৎসাহে, বারাদশী ধর্মীয়ত যন্ত্রালয় হইতে এই পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ভূধর চট্টোপাধ্যায় (পরে ‘বেদব্যাস’-সম্পাদক) পত্রিকাখানি পরিচালন করিতেন। “বালক ও যুবকবৃন্দের হৃদয়ে আধ্যাত্মিকতাবোধের প্রবর্তনা ও আধ্যাত্মবোধের উদ্দীপনা করাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য।” ইহা এক বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল। তিন বৎসর পরে, ১২৯০ সালের কার্তিক (?) মাসে ইহা ‘ত্বনীতি ও সংবাদ’ নামে পুনঃপ্রকাশিত হয়।

সচিত্র পারশ্ব কুসুম (মাসিক)। কাশ্বন ১২৯০। সম্পাদক—বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়।

ব্রহ্মসংগ্রহ (মাসিক)। কাশ্বন ১২৯০। প্রকাশক—রাজেন্দ্রলাল দাস বোষ, ঢাকা।

অনেক দিন পরে—১৩২২ সালের বৈশাখ মাসে পূর্ণানন্দ স্বামীর সম্পাদকত্বে আদি বুদ্ধ পত্র ‘বুদ্ধ বঙ্গ’র নব পর্যায় প্রচারিত হইয়াছিল।

সাহাগিনী (মাসিক)। বৈশাখ ১২৯১।

সম্পাদিকা—কৃষ্ণরঞ্জিনী বসু ও জামাদিনী দে। ১ নং পরাণহাটা ষ্ট্রীট হইতে কদমলাল মিল কর্তৃক প্রকাশিত।

তপস্বিনী (মাসিক)। বৈশাখ ১২৯১।

জীবনচক্র ভক্ত কর্তৃক চিৎপুর হইতে প্রকাশিত।

কুসুমমালা (মাসিক)। বৈশাখ ১২৯১।

সম্পাদক—দেবেজনাথ বসু।

চিকিৎসা-সঙ্গিলনী (মাসিক)। বৈশাখ ১২৯১।

টাকীর জমিদার রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরীর বিশেষ উদ্যোগে চিকিৎসা-বিষয়ক এই মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সম্পাদক—ডাঃ অন্নদাচরণ ঋগুগিরি ও কবিরাজ অবিনাশচন্দ্র কবিরাজ। পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যার “ভূমিকা”য় প্রকাশঃ—“প্রচলিত চিকিৎসা-সমূহের মধ্যে কোনটি দ্বারা কোন্ রোগের বিশেষ উপকার হয়, দৃষ্টকলামুসারে তাহা নির্বাচন করিতে কলিকাতাহ লরুনায়া ও কৃতবিদ্য চিকিৎসকগণের সাহায্যে ‘চিকিৎসা-সঙ্গিলনী’ নামক অর্থাৎ কবিরাজী ও ডাক্তারী এই উভয়বিধ চিকিৎসার মধ্যে আমাদের দেশে কোন্ কোন্ রোগে কোন্ কোন্ চিকিৎসা বিশেষরূপে উপযোগী, অল্পচিকিৎসা ও পিচকারী দেওয়া প্রভৃতি আন্তঃকলমায়ক ক্রিয়াগুলি ঐ উভয়বিধ চিকিৎসার কাহার মধ্যে কত দূর উৎকৃষ্ট এবং রোগপরীক্ষা, দ্রব্যগুণতত্ত্ব ও স্বাস্থ্যরক্ষা প্রভৃতি চিকিৎসকের অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়গুলিই বা কোন্ মতে কত দূর শ্রেষ্ঠ; তাহাবিষয়ক আলোচনাপূর্ণ একখানি পত্রিকা প্রচার করিতে উদ্যোগ করিলাম।”

ব্রাহ্মজীবন (মাসিক)। বৈশাখ ১২৯১।

“ব্রাহ্মজীবন নামে একখানি ক্ষুদ্র পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছে। যাহাতে ব্রাহ্মগণ উপাসনামূলক হন এবং পারিবারিক সমস্ত কার্য ব্রাহ্ম ধর্মামুসারে সম্পন্ন করেন ইহাই এই পত্রিকাখানির উদ্দেশ্য।...ধর্মবঙ্গ কার্যালয়—১২ নং ব্রহ্মনাথ দস্তের লেন।”—‘ধর্ম বঙ্গ,’ ১ জ্যৈষ্ঠ ১২৯১।

জংসঙ্গ (মাসিক)। বৈশাখ ১২৯১।

বহরমপুর হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়। ইহার ২য় ভাগ প্রকাশিত হয়—১৩০১ সালের বৈশাখ মাসে।

ভূষণী কাকের নকশা (মাসিক)। আষাঢ় ১২৯১।

বিজ্ঞপাত্তক পত্র। প্রকাশক—অম্বিকাচরণ মোদক।

রত্নাকর (পাক্ষিক)। আষাঢ় ১২৯১।

হিন্দুধর্মপ্রচারক পত্রিকা। প্রকাশক—বংশীনাথ বসাক, ঢাকা শীতল প্রেস।

ভূত (মাসিক)। আষাঢ় ১২৯১।

এই সচিত্র পত্রিকায় কেবল ব্যঙ্গ রচনাই স্থান পাইত।

জাহ্নবী (মাসিক)। আষাঢ় ১২৯১।

“সর্বথা আত্ম মানব পশুভাবাপন্ন বা পশু হইতেও নিরুপ্ত, জ্ঞতরাং পতিত। পতিত উদ্ধার করিবার জন্তই জাহ্নবীর অবতারণা।” সম্পাদক—বীরেশ্বর পাণ্ডে।

নবজীবন (মাসিক)। আষাঢ় ১২৯১।

উচ্চাঙ্গের মাসিকপত্র; সম্পাদন করিতেন—‘সাধারণী’-সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র সবকার। ‘নবজীবনে’র পরমাণু ৫ বৎসর; শেষ সংখ্যা—৫ম ভাগ, ১২শ সংখ্যা, ভাদ্র ১২৯৬। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, চন্দ্রনাথ বসু, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রমুখ মহারথীদের রচনা ইহার পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত করিত। আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর দ্বিবেদীর হাতে খড়ি এই ‘নবজীবনে’; তাঁহার প্রথম রচনা—“মহাশক্তি” ১ম বর্ষের পৌষ-সংখ্যায় স্থান লাভ করিয়াছিল।

প্রচার (মাসিক)। আষাঢ় ১২৯১।

আমাতা রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে পুরোভাগে রাখিয়া বঙ্কিমচন্দ্র এই ক্ষুদ্র মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। তিনি লিখিয়াছেন :—“নবজীবনের পনের দিন পরে, প্রচারের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইল। প্রচার, আমার সাহায্যে ও আমার উৎসাহে প্রকাশিত হয়। নবজীবনে আমি হিন্দুধর্ম—যে হিন্দুধর্ম আমি গ্রহণ করি—তাহার পক্ষ সমর্থন করিয়া নিয়মক্রমে লিখিতেছিলাম। প্রচারেও ঐ বিষয়ে নিয়মক্রমে লিখিতে লাগিলাম।” এই ‘প্রচারে’ই বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ উপজ্ঞাস ‘সীতারাম’ প্রথমে মুদ্রিত হইয়াছিল। ‘প্রচার’ চারি বৎসর (১২৯৫ পর্য্যন্ত) চলিয়া বিলুপ্ত হয়।

কালভৈরব (মাসিক)। আষাঢ় ১২৯১।

বিজ্ঞাপাত্ৰক পত্র। সম্পাদক—মাধনলাল চক্রবর্তী।

গৃহস্থালী (মাসিক)। আষাঢ় ১২৯১।

সম্পাদক—বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক—ডাঃ হরনাথ বসু। পত্রিকার মলাটে এই শ্লোকাংশ মুদ্রিত হইত :—“চতুর্নামাশ্রমাণাং হি গার্হস্থ্যং শ্রেষ্ঠমাশ্রমম্।”

আলোচনা (মাসিক)। ১৫ ভাদ্র ১৮০৬ শক।

ধর্ম, সমাজ ও নীতি বিষয়ক উচ্চাঙ্গের মাসিক পত্রিকা। সম্পাদক—গগনচন্দ্র হোম। গগনচন্দ্র ‘জীবন-স্মৃতি’তে বলিয়াছেন :—“বঙ্গবর বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের নেতৃত্বে আমরাও ‘আলোচনা’ প্রকাশ করিয়াছিলাম। এই মাসিক পত্রিকার পরিচালনাতার ছিল আমার উপর।” ‘আলোচনা’র পরমাণু দুই বৎসর।

বার্ষিক (মাসিক)। আখির ১২২১।

শান্তিপুর হইতে শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। হিন্দুধর্মের ঐশ্বর্যকল্পে প্রতিষ্ঠিত কালনা সভার মুখপত্র।

গঙ্গা (মাসিক) আখির ১২২১।

সম্পাদক—বিপিনবিহারী দত্ত। চুঁচুড়া অরণ্য প্রেস হইতে প্রকাশিত।

পতাকা (সাপ্তাহিক)। কার্তিক (৭) ১২২১।

১২২১ সালের কার্তিক-সংখ্যা 'ভারতী'তে ১ম সংখ্যা সমালোচিত। 'পতাকা' সম্পাদন করিতেন—ভূতপূর্ব 'বঙ্গবাসী'-সম্পাদক জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়, এম. এ., বি. এল। ইহা বছর-দুই মগোরবে চলিবার পর 'স্মৃতি' পত্রিকার সহিত সম্মিলিত হইয়া যায়।

সমাজ সংস্কার (মাসিক)। কার্তিক ১২২১।

সম্পাদক—বিহারীলাল দাসগুপ্ত।

আয়ুর্বেদ-সঞ্জীবনী (মাসিক)। অগ্রহায়ণ (৭) ১২২১।

"আয়ুর্বেদীয়-চিকিৎসা-বিষয়ক মাসিক পত্র এবং সমালোচন।" কবিরাজ গঙ্গাশ্রাদ সেনের অল্পমতি অল্পমারে কবিরাজ অন্নদাশ্রাদ সেন এবং কবিরাজ কালীশ্রাদ সেনের তত্ত্বাবধানে কবিরাজ ভগবতীশ্রাদ সেন ও হরিশ্রাদ সেন কবিরাজ কর্তৃক সম্পাদিত। ১৭ নং কুমারটুলী হইতে প্রকাশিত।

ভোজবাজী (মাসিক)। মাঘ ১২২১।

বালকদিগের পাঠোপযোগী ইংরাজি, রসায়ন ও ম্যাজিক সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা। সম্পাদক—অমৃতলাল বসু।

ভারত (মাসিক)। মাঘ ১২২১।

প্রকাশক—রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, বাগবাজার বান্ধব-পাঠ-সমাজ, ১২ কালীশ্রাদ চক্রবর্তীর ষ্ট্রীট। প্রতি সংখ্যার মূল্য ১/১০।

রাজ চিকিৎসক (মাসিক)। কান্তন (৭) ১২২১।

চিকিৎসা-সম্বন্ধীয় মাসিকপত্র। সম্পাদক—রামচন্দ্র মল্লিক। প্রাপ্তিস্থান—২২ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, চন্দ্রকিশোর সেনের আয়ুর্বেদ ঔষধালয়।

পরিণাম (মাসিক)। কান্তন ১২২১।

সম্পাদক—কালীশ্রাদ চট্টোপাধ্যায়।

প্রসূতিশিক্ষা নাটক (মাসিক)। বৈশাখ ১২২২।

নাটকীয় সংলাপে লিখিত। সম্পাদক—প্রমথনাথ দাস, এম. বি.।

বালক (মাসিক)। বৈশাখ ১২২২।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহধর্মিণী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সম্পাদনায় এই সচিত্র মাসিক পত্র প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'তে লিখিয়াছেন :—

“বালকদের পাঠ্য একটি সচিত্র কাগজ বাহির করার জন্য মেজবউঠাকুরাণীর বিশেষ আগ্রহ জন্মিয়াছিল। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, সুবীজ্য বলেজ্য প্রভৃতি আমাদের বাড়ির বালকগণ এই কাগজে আপন আপন রচনা প্রকাশ করে। কিন্তু শুধুমাত্র তাহাদের লেখায় চলিতে পারে না জানিয়া, তিনি সম্পাদক হইয়া আমাদের রচনার ভার গ্রহণ করিতে বলেন।”

‘বালক’ এক বৎসর সগৌরবে চলিবার পর ‘ভারতী’র সহিত সম্মিলিত হইয়া যায়।

ভারতবাসী (সাপ্তাহিক)। বৈশাখ ১২৯২।

“এই বৃহদাকার পত্রখানি বৈশাখ মাস হইতে প্রকাশিত হইতেছে। সম্পাদকীয় কার্য অতি গুরুতর, সে ভার বাবু হরিদাস গড়গড়ীর হস্তে ছাড়া হইয়াছে। হরিদাস বাবু সাহিত্যসংসারে সুপরিচিত।...এখানি কলিকাতার প্রসিদ্ধ ধনী ও ব্যবসায়ী পি. এম. সুর কোম্পানির দ্বয়ে প্রচারিত হইতেছে।...নগদ মূল্য দুই পয়সা।” (‘আদরিণী,’ জ্যৈষ্ঠ ১২৯২) **দৈনিক (প্রাত্যহিক)।** বৈশাখ ১২৯২।

“বঙ্গবাসীর স্বত্বাধিকারীগণ দিন দিন অল্প মূল্যের সংবাদপত্র প্রকাশ করিয়া সাধারণের ধন্যবাদভাজন হইতেছেন, ও স্বদেশের মহোপকার করিতেছেন। দৈনিক সপ্তাহে পাঁচ দিন প্রকাশিত হয়, বার্ষিক মূল্য ৪২ টাকা মাত্র।...নগদ মূল্য এক পয়সা।” (‘আদরিণী,’ জ্যৈষ্ঠ ১২৯২)

‘দৈনিক’ কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত হয়। অল্প দিন অল্প হস্তে থাকিয়া ইহা প্রায় ১৪ বৎসর ক্ষেত্রমোহন সেনগুপ্ত বিজ্ঞানব্দের সম্পাদনায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

কৃষি গেজেট (মাসিক)। বৈশাখ ১২৯২।

“কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক মাসিক পত্রিকা।” সম্পাদক—‘বঙ্গবাসী’ কলেজের প্রতিষ্ঠাতা গিরিশচন্দ্র বসু।

সীতা (মাসিক)। বৈশাখ ১২৯২।

সম্পাদক—ননীগোপাল মুখোপাধ্যায়।

শিল্প কৃষি পত্রিকা (মাসিক)। জ্যৈষ্ঠ ১২৯২।

তাহিরপুর হইতে প্রকাশিত ও বিনামূল্যে বিতরিত। পরিচালক—কুমার খশি-শেখরেখর রায়।

কুশদহ (সাপ্তাহিক)। জ্যৈষ্ঠ ১২৯২।

ইহা পরবর্তী শ্রাবণ মাস হইতে ‘ভেরি’ পত্রিকার সহিত মিলিত হইয়া যায়। ১২৯৩ সালের ভাদ্র মাস হইতে ‘কুশদহ ও ভেরি’ আবার ‘অল্প সমাচারে’র সহিত সম্মিলিত হইয়া ‘অল্প সমাচার ও কুশদহ’ নাম ধারণ করে। ১২৯৪, ২৮এ শ্রাবণ তারিখের ‘অল্প সমাচার ও কুশদহে’ প্রকাশিত সহকারী কার্যাব্যাহ্য অটলবিহারী দত্তের বিজ্ঞাপনে প্রকাশ :—

“১২৯২ সালের জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে ‘কুশদহ’ নামে যে পত্রিকা বাহির হয় তাহা কিছু দিন পরে ভেরির সহিত মিলিত হইয়াছিল। পরে বিগত ১২৯৩ সালের ভাদ্র মাস

হইতে ‘অলভে’র সহিত মিলিত হইয়া কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইতেছিল। তাহাতে নানা প্রকার কার্যের অনুবিধা ও সময়ে বাহির না হওয়ায় আমরা আমাদের “মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেস” মঙ্গলগঞ্জে আনাইয়া, এই ‘অলভ সমাচার ও কুশদহ’ পত্রিকা যথানিয়মে এখান হইতে বাহির করিতেছি।”

নমাজ-দীপিকা (মাসিক)। ১৫ জ্যৈষ্ঠ ১২২২।

“হিন্দুধর্মের ঐতিহাসিকরণ, হিন্দুসমাজের পুনঃসংস্কার, উহাদিগের আবিল রীতিনীতি, আচার, ব্যবহারের পরিবর্তি-সাধন এই সকল বিষয়েই পত্রিকার বিশেষ লক্ষ্য থাকিবে।”

চতুর্থ সংখ্যা (১৫ ভাদ্র) হইতে সম্পাদক-রূপে অক্ষয়কুমার বিজ্ঞাবিনোদের নাম মুদ্রিত হইতে থাকে। ইহা ৪২ নং মেছুয়া বাজার রোড হইতে প্রকাশিত হইত।

দিনাজপুর পত্রিকা (মাসিক)। জ্যৈষ্ঠ ১২২২।

দিনাজপুর হইতে প্রকাশিত। “উদ্দেশ্য—কৃষিই এদেশের এক মাত্র জীবনোপায়। জীবনসর্বস্ব সেই কৃষিকার্য, কি প্রণালীতে পরিচালিত হইলে কার্যের উৎকর্ষতা বর্জিত হইতে পারে, সেই সমস্ত বিষয়ই আমাদের প্রধান আলোচ্য; স্মরণীয় কৃষিবিষয়ক ঘটনাবলি লইয়াই আমরা ক্রমে পর্যালোচনা করিব; কিন্তু তাহা বলিয়া যে অন্ত কোন বিষয়ই এ পত্রিকার আলোচ্য বিষয় নহে, এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞায় দিনাজপুর পত্রিকা আবদ্ধ নহে।”

সম্পাদক—ব্রজেশচন্দ্র সিংহ চৌধুরি, বি-এ, বি-এল। পত্রিকাখানি দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়াছিল।

শিল্পপুস্পাঞ্জলি (মাসিক)। আষাঢ় ১২২২।

শিল্প, সাহিত্য, সরল বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ক সচিত্র মাসিক পত্র ও সমালোচন।

সম্পাদক—অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভারতে হরিদ্বনি (মাসিক)। আষাঢ় ১২২২।

রাজা রাধাকান্ত দেবের বাটী হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—শিবচন্দ্র বসু ও কালীকুমার ঘোষ।

বিজলী (মাসিক)। আষাঢ় ১২২২।

বেরা, ফরিদপুর, পাবনা হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—জামাচরণ মজুমদার।

ভক্ত-মঞ্জরী (মাসিক)। ১ শ্রাবণ ১৮০৭ শক।

সম্পাদক—রামচন্দ্র দত্ত। “নীতি ধর্ম এবং সমাজসংস্কার মাসিক পত্রিকা।” পরমহংস রামকৃষ্ণের উপদেশাবলী প্রচারকল্পেই ইহার আবির্ভাব। পরমায়ু—দুই বৎসর।

১৩০৪ সালের বৈশাখ মাস হইতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণচরণাশ্রিত সেবকমণ্ডলী কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া ইহা পুনঃপ্রকাশিত হয়। ইহা ইংরেজী ও বাংলা উভয় ভাষাতেই লিখিত হইত।

নব-নলিনী (মাসিক)। শ্রাবণ ১২২২।

সম্পাদক—স্বরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য। প্রকাশক—রামনুসিংহ চট্টোপাধ্যায়, আব্দুল-বাড়িয়া (মদীরা)।

নিবন্ধ (মাসিক)। ভাদ্র ১২২২।

বহরমপুর হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—হরিকিশোর রায়।

পল্লীগ্রাম (মাসিক)। ভাদ্র (১) ১২২২।

রাণাঘাট হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—ডাঃ যত্ননাথ মুখোপাধ্যায়।

ত্রেমাসিক হোমিওপ্যাথিক বার্তাবহ। ভাদ্র (১) ১২২২।

সম্পাদক—অক্ষয়প্রসাদ দত্ত। প্রকাশক—কে. দত্ত. এণ্ড কোম্পানী।

বৈষ্ণব (মাসিক)। আশ্বিন, ঐতৈতভ্যাব্দ ৪০০।

সম্পাদক—কালিদাস নাথ। বৈষ্ণব জগতের হিতসাধনার্থ ইহার আবির্ভাব। পত্রিকার
কর্ত্তে এই শ্লোকটি মুদ্রিত হইত :—

রসং প্রাংসন্ত কবিস্বনিষ্ঠাঃ।

ব্রহ্মামৃতং বেদশিরোন্যবিষ্ঠাঃ॥

বয়স্তু গুঞ্জা কলিতাবতং সঃ।

গৃহীতবংশং কমপি শ্রমায়মঃ॥

শ্রীমন্ত সওদাগর (মাসিক)। কার্ত্তিক (১) ১২২২।

৩ নং আহিরিটোলা হইতে প্রকাশিত। ইহাতে প্রবন্ধ, উপভাস, সংবাদ, বাজার-দর
প্রভৃতি স্থান পাইত। সম্পাদক—চন্দ্রকিশোর রায়। ১২২৩ সালের অগ্রহায়ণ-সংখ্যা
‘বিশ্বকর্মা’ পত্রে ইহার ২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যার প্রাশ্ণিকার আছে।

হোমিওপ্যাথিক অনুবাদক (মাসিক)। কার্ত্তিক ১২২২।

ঢাকা গিরিশযন্ত্র হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—কুঞ্জবিহারী ভট্টাচার্য্য।

বঙ্গবালা (মাসিক)। কার্ত্তিক ১২২২।

সম্পাদক—কালীচরণ বসু।

বিবিধ তত্ত্ব (মাসিক)। কার্ত্তিক ১২২২।

চিকিৎসা, শিল্প, পাকবিজ্ঞা ও ইঞ্জিনালাদি বিষয়ক মাসিক পত্র। ৩৭ নং হরিতকী
বাগান লেন হইতে রামকুমার নাথ সরকার কর্ত্তক লঙ্ঘলিত ও প্রকাশিত।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক (মাসিক)। অগ্রহায়ণ ১২২২।

সম্পাদক—জগদীশচন্দ্র লাহিড়ী ও বিপিনবিহারী মৈত্র, এম. বি.। ১৫ নং কলেজ
স্কোয়ার কলিকাতা হইতে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ-বিক্রেতা ও প্রকাশক লাহিড়ী এণ্ড কোং
কর্ত্তক প্রকাশিত।

ভারত শ্রমজীবী (মাসিক)। অগ্রহায়ণ ১২২২।

ইহা পূর্বতন ‘ভারত শ্রমজীবী’র “দ্বিতীয় কল্প” ও “প্রধানতঃ কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান
ও সাহিত্য বিষয়ক সচিত্র মাসিকপত্র।” সম্পাদক—শশিভূষণ বিশ্বাস।

মহাবিজ্ঞা (মাসিক)। অগ্রহায়ণ ১২২২।

তত্ত্ববিজ্ঞা, অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান ও আধ্যাত্ম-প্রচারক মাসিক পত্রিকা। সম্পাদক—কুঞ্জবিহারী

গুট্টাচার্য, এফ. টি. এল। ঢাকা গিরিশবল্লভে মুদ্রিত। ইহা ১২২৪ সালে স্থানীয় সাপ্তাহিক পত্র ‘গরীবের’ সহিত সম্মিলিত হইয়া ‘গরীব ও মহাবিপ্লব’ নাম ধারণ করে।

* * *

১৮৮৫ সনে আরও কয়েকখানি সাময়িক-পত্রের অস্তিত্বের পরিচয় পাইতেছি; এগুলি সম্ভবতঃ ১৮৮৪ সনে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল :—

১। জ্ঞাপান; ২। কুমারী পত্রিকা (সাপ্তাহিক); ৩। ভারতমিহির (মাসিক, ৪৬ পঞ্চাননতলা, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত); ৪। পূর্ববঙ্গবাসী (সাপ্তাহিক)।

ঢাকা গেজেট (সাপ্তাহিক)। ইং ১৮৮৬ (৭)

ঢাকা হইতে প্রকাশিত, ইংরেজী-বাংলা সাপ্তাহিক পত্র। সম্পাদক—শশিভূষণ রায়, ভূতপূর্ব ‘ঈষ্ট’-সম্পাদক। ১২২৩, অগ্রহায়ণ-সংখ্যা ‘বিশ্বকর্মা’ পত্রে সমালোচিত।

বিদ্যুৎ (মাসিক)। মাঘ ১২২২।

সম্পাদক—কালীকিঙ্কর আর্ধ্যরত্ন।

ধুমকেতু (সাপ্তাহিক)। ৪ বৈশাখ ১২২৩।

চন্দননগর হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—শিবকৃষ্ণ মিত্র। পত্রিকার কণ্ঠে এই শ্লোকটি মুদ্রিত হইত :—

“চিন্তন্যত্যন্তভং যোহি অস্তভং তন্ত সংভবেৎ।”

‘ধুমকেতু’র ২য় বর্ষ ১৬শ সংখ্যার প্রকাশকাল—১৪ আশ্বিন ১২২৪, শুক্রবার (২২-৭-১৮৮৭)।

বেদব্যাস (মাসিক)। বৈশাখ ১২২৩।

“হিন্দুধর্মের প্রকৃত মহিমাকীর্তনই বেদব্যাসের উদ্দেশ্য।” সম্পাদক—ভূষণ চট্টোপাধ্যায়।

শশধর তর্কচূড়ামণি এই পত্রিকার সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

গার্হস্থ্য বিজ্ঞান (মাসিক)। বৈশাখ ১২২৩।

“যোগ, জ্যোতিষ, শিল্প, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, সঙ্গীত, বাজ, রন্ধন, কারুকার্য, চিত্র, মুষ্টিযোগ, ম্যাজিক, ইন্দ্রজ্ঞান, প্রভৃতি মানবের আবশ্যকীয় জ্ঞাতব্য বিষয়” সম্বন্ধে সচিত্র মাসিকপত্র।

সম্পাদক—অমৃতলাল বসু, নদীয়ার অন্তর্গত নকাসিপাড়া ধানার পুলিশ সব-ইনস্পেক্টর।

গ্রামবাসী (পাক্ষিক...)। বৈশাখ ১২২৩ (৭)

উত্তরবেড়িয়া হইতে প্রকাশিত; স্থানীয় গ্রামবাসীকে রাজনীতি-বিষয়ক শিক্ষা দেওয়াই ইহার উদ্দেশ্য ছিল। ১২২৬, বৈশাখ হইতে ইহা সাপ্তাহিক পত্রে পরিণত হয়।

আর্য্যপ্রতিভা (সাপ্তাহিক)। বৈশাখ ১২২৩ (৭)

হালিশহর হইতে প্রকাশিত।

বাণিজ্য ভাণ্ডার (মাসিক)। বৈশাখ (৭) ১২২৩ সাল।

‘জ্ঞান সমাচার ও কুশদেহ’ (১২ ভাদ্র ১২২৩) ইহার বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইয়াছে।

বঙ্গরবি (মাসিক)। আষাঢ় ১২২৩।

পরিচালক—ঈশানচন্দ্র সাবুই।

আহমদী (পাক্ষিক)। প্রাবণ ১২৯৩।

ময়মনসিংহ টাঙ্গাইল হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—আবদুল হামিদ খান আহমদী ইউজুফজরী। এই পত্রিকা সম্বন্ধে ‘সুসম্পন্ন সমাচার ও কুশদহ’ (৯ ভাদ্র ১২৯৫) লেখেন :—
“আহমদী নামক পাক্ষিক পত্রের ৩য় খণ্ডের ১ম ও ২য় সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়া আমরা সুখী হইলাম।...প্রান্তঃশরগীয়া আদর্শ মুসলমান মহিলা মাননীয়া শ্রীমতী করিমম্নেছা খানম চৌধুরাণীর সংগ্রহেই ‘আহমদী’ চলিতেছে। মুসলমানদিগের কয়েকখানি সংবাদপত্র কলিকাতায় কিছু দিন পূর্বে বাহির হইয়াছিল, কিন্তু ‘আখব্বারে এসলামিয়া’ ভিন্ন আর সকলগুলিই লুপ্ত হইয়াছে। ‘আহমদী’ মুসলমান সম্প্রদায়ের গৌরবস্বরূপ। ইহার অসাম্প্রদায়িকতা এবং জ্ঞাননিষ্ঠা দেখিয়া আমরা অতিশয় প্রীত হইলাম।” ১২৯৬ সালে ইহার নাম ‘আহমদী ও নবরত্ন’ পাইতেছি। সম্ভবতঃ ‘নবরত্ন’ নামে কোন স্থানীয় পত্র ইহার সহিত সম্মিলিত হইয়া এইরূপ নাম ধারণ করে।

কান্নিকর দর্পণ (মাসিক)। আশ্বিন ১২৯৩।

“মেশিন, ইঞ্জিন প্রভৃতি প্রস্তুত প্রণালী বিশেষরূপে প্রচার করিবার জন্ত প্রত্যেক মেশিন প্রভৃতির প্রতিকৃতি সহ” ইহা প্রকাশিত হইত। সম্পাদক—বিহারীলাল ঘোষ।

বিশ্বকর্মা বা বিজ্ঞান রহস্য (মাসিক)। আশ্বিন ১২৯৩।

বাণিজ্য, বিজ্ঞান এবং শিল্প শিক্ষাপযোগী প্রবন্ধমালা বিবিধ ভাষার সংবাদপত্র এবং গুপ্তক হইতে বাংলা ভাষায় অনূদিত হইয়া এই সচিত্র মাসিক পত্রিকার কলেবর পূর্ণ করিত। সম্পাদক—বিহারীলাল ঘোষ।

ভিষক-বন্ধু (মাসিক)। আশ্বিন ১২৯৩।

সম্পাদক—ভোলানাথ চক্রবর্তী।

পল্লীপ্রকাশ (মাসিক)। আশ্বিন ১২৯৩।

কুচবিহার হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—যোগেন্দ্রনারায়ণ রায়।

উপজাঙ্গলহরী (মাসিক)। কার্তিক ১২৯৩।

সম্পাদক—তারকনাথ বিশ্বাস।

দ্বৈভাষিকী (মাসিক)। ১৮ ফাল্গুন ১২৯৩।

‘সঙ্গাবশতক’র কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার বশোহর জিলা-স্কুলে শিক্ষকতাকালে এই দ্বিভাষিক—সংস্কৃত-বাংলা পত্রিকা প্রকাশ করেন। “ইহাতে রাজনীতি, উপাখ্যান ও সংবাদ বিনা গল্পপাঠে বিবিধ হিতকর বিষয় লিখিত” হইত। পত্রিকার শিরোনামে এই শ্লোকটি মুদ্রিত হইত :—

“জন্মেদং বক্ষ্যতাং নীতং ভবভোগোপলিপ্সয়া।

কাচ-মূল্যে বিক্রীতো হস্ত চিন্তামনির্ঘয়া ॥”

‘দ্বৈভাষিকী’র পরমায়ু এক বৎসর।

সমসী (মাসিক)। ফাল্গুন ১২২৩।

ময়মনসিংহ হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—ব্রজনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

অধ্যয়ন (মাসিক)। চৈত্র ১২২৩।

সম্পাদক—রামদয়াল মজুমদার।

গান ও গল্প (পাক্ষিক)। বৈশাখ ১২২৪।

এই “পাক্ষিক পত্র ও সমালোচন” প্রতি পক্ষান্তর অর্থাৎ মাসের ১লা ও ১৫ই তারিখে প্রকাশিত হইত। যতীলাল বসু (নাট্যকার মনোমোহনের পুত্র ও বোম্বে সার্কাসের প্রতিষ্ঠাতা) ইহার সম্পাদক ছিলেন। রাজকৃষ্ণ রায়, রজনীকান্ত গুপ্ত, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, রামোদর মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট সাহিত্যিকগণ ইহার লেখকশ্রেণীভুক্ত ছিলেন। চতুর্থ সংখ্যায় (১৫ জ্যৈষ্ঠ ১২২৪) তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের “স্বপ্ন ও দুঃখ” নামে একটি গল্প প্রকাশিত হইয়াছিল।

কর্ণধার (মাসিক)। বৈশাখ ১২২৪।

মাসিকপত্র ও সমালোচন; সম্পাদক—হারাগচন্দ্র রক্ষিত। বার্ষিক মূল্য এক টাকা।

বীণাপাণি (মাসিক)। বৈশাখ ১২২৪।

“বীণাপাণি, মাসিক পত্রিকা। ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা—বৈশাখ। শ্রী প্রকাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১১০ টাকা। বীণাপাণির আবির্ভাবে আমরা বড় সুখী হইয়াছি। প্রধানতঃ সনাতন হিন্দুধর্ম সম্বন্ধীয় আলোচনা ইহার উদ্দেশ্য। প্রবন্ধগুলি অতি সুন্দররূপে নির্বাচিত ও সুদয়গ্রাহী হইয়াছে। বর্তমান সমাজে এরূপ পত্রিকার বহুল প্রচার একান্ত আবশ্যিক।”—‘কর্ণধার,’ জ্যৈষ্ঠ ১২২৪।

চিকিৎসাদর্শন (মাসিক)। বৈশাখ ১২২৪।

নদীয়া, মোল্লাবেলিয়া হইতে প্রকাশিত, চিকিৎসা-বিষয়ক প্রবন্ধপূর্ণ মাসিকপত্র ও সমালোচন; সম্পাদক—রজনীকান্ত মুখোপাধ্যায়।

হিন্দুধর্ম (সাপ্তাহিক)। বৈশাখ ১২২৪।

“আমরা ‘হিন্দুধর্ম’ নামক একখানি নতুন সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রাপ্ত হইয়াছি।”—‘সুভদ্রা সমাচার ও কুশদহ,’ ২৮ জ্যৈষ্ঠ ১২২৪।

দীপিকা (মাসিক)। বৈশাখ ১২২৪।

৭।১ অভয় হালদার লেন, কলিকাতা, সুভদ্রা সাহিত্য প্রকাশ কার্যালয় হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—প্যারীমোহন হালদার।

নব-মুগ (মাসিক)। বৈশাখ ১২২৪।

সম্পাদক—আনন্দচন্দ্র মিত্র।

কামনা (মাসিক)। বৈশাখ (৭) ১২২৪।

ঢাকা গিরিশ-বসু হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—শশীভূষণ দত্ত।

সাম্যবাদী (মাসিক)। বৈশাখ (৭) ১৮০২ শক।

“উদ্ভিষ্টা হইতে প্রকাশিত ‘সাম্যবাদী’ নামে একখানি মাসিক পত্রিকা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। পত্রিকাতে অতি উদারভাবে ধর্ম, নীতি ও মিথ্যার বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিত হইয়া থাকে। পত্রিকা বিনামূল্যে বিতরণিত হয়।”—‘ধর্মতত্ত্ব,’ ১৬ আষাঢ়, ১৮০২ শক।

কাল্লালের জেজ্ঞাণ্ড-বেদ। আশ্ব ও সাধনতম্ব। ১২২৪ সাল।

কুমারখালী হইতে প্রকাশিত। কাল্লাল-ফিকিরচাঁদ ফকীর [হরিনাথ মজুমদার] কর্তৃক সম্পাদিত। ৬ ভাগে প্রকাশিত; প্রত্যেক ভাগ ১২ সংখ্যায় সম্পূর্ণ।

হিন্দু মুসলমান সম্মিলনী (মাসিক) । আবার ১২২৪ ।

সম্পাদক—মুনসী গোলাম কাদের ।

শুশ্রূষা জ্ঞানরত্ন সংগ্রহ (মাসিক) । আবার ১২২৪ ।

ডাঃ এ. সি. বসু কর্তৃক প্রকাশিত ।

অমুসন্ধান (পাক্ষিক...) । ১৩ আবার ১২২৪ ।

অমুসন্ধান-সমিতির পাক্ষিক পত্র । নানারূপ জুয়াচুরি হইতে দেশের লোককে সতর্ক করাই ‘অমুসন্ধানে’র উদ্দেশ্য । প্রথম সম্পাদক—জুর্গাদাস লাহিড়ী । ৮ম বর্ষ (২১ বৈশাখ ১৩০১) হইতে ইহা সাপ্তাহিক পত্রে পরিণত হয় ।

সংসার দর্পণ (মাসিক) । আবার ১২২৪ ।

১৩ নং বোড়াবাগান ষ্ট্রীট হইতে প্রসাদকুমার যুগোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত । সংসার, সমাজ, বিজ্ঞান, প্রভৃতি বিষয় সকল আলোচনা করাই পত্রিকাখানির উদ্দেশ্য ছিল । সুপ্রসিদ্ধ কথা-সাহিত্যিক কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ‘সংসার দর্পণ’ সম্পাদন করিতেন । পত্রিকাখানির পরমায়ু দুই বৎসর ।

সচিত্র কৃষি শিক্ষা (মাসিক) । ভাদ্র ১২২৪ ।

ঢাকা গিরিশ-বজ্র হইতে প্রকাশিত । সম্পাদক—কালীকুমার মুন্সী ।

সারসংগ্রহ (মাসিক) । ভাদ্র ১২২৪ ।

বীরভূম জেলা মজারপুর পোঃ অঃ মজুট গ্রাম হইতে প্রকাশিত, মূল্য দুই টাকা ; সম্পাদক—হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ।

বিভা (মাসিক) । আশ্বিন ১২২৪ ।

ইহা “ঐচারুচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক ৬১ নং বাহির শ্রামবাড়ার হইতে প্রকাশিত ।” ভাওয়ালের কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন বলিয়া মনে হয় । ইহার ৭ম-৮ম (চৈত্র-বৈশাখ) যুগ্ম-সংখ্যায় মুদ্রিত দাস-কবির ‘প্রেম ও ফুল’ কাব্যের সমালোচনা প্রসঙ্গে এইরূপ মন্তব্য আছে :—“ ‘প্রেম ও ফুল’ বিভা প্রকাশক প্রকাশ করিয়াছেন । আমাদের ইহার অধিক সমালোচনা করা ভাল দেখায় না ।...”

‘বিভা’ একখানি উচ্চাঙ্গের মাসিক পত্রিকা ছিল । ইহার পৃষ্ঠায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর অনেকগুলি রচনা মুদ্রিত হইয়াছিল ; দৃষ্টান্তস্বরূপ ১ম ও ২য় সংখ্যায় মুদ্রিত তাঁহার “জাতিভেদ” প্রবন্ধের উল্লেখ করা যাইতে পারে । প্রবন্ধের শেষে লেখকের নামোল্লেখ নাই, কিন্তু ঐ দুই সংখ্যা পত্রিকার মলাটে মুদ্রিত প্রবন্ধ ও লেখকের নাম-স্মৃতিতে শাস্ত্রী-মহাশয়ের নাম আছে ।

ধর্ম-নিগম (মাসিক) । আশ্বিন ১২২৪ ।

ধর্মবিষয়ক মাসিক পত্রিকা । শশীভূষণ নন্দী কর্তৃক সম্বলিত ।

ভারতবন্ধু ও জাহানাবাদ পত্র (মাসিক) । ফাল্গুন (১) ১২২৪ ।

সম্পাদক—আক্তোষ শুক্ল ।

‘বামাবেদিনি পত্রিকা’র (ভাদ্র ১২২৪) ‘খৃষ্টীয় প্রহরী,’ এবং ‘বিভা’র (পৌষ ১২২৪) ‘গরীব ও মহাবিভা’ নামে দুইখানি পত্রিকার প্রাপ্তিস্বীকার আছে । ‘গরীব’ ঢাকা হইতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক পত্র ; ইহার সহিত স্থানীয় ‘মহাবিভা’ সম্মিলিত হইয়া ‘গরীব ও মহাবিভা’ নাম ধারণ করে । এই পত্রিকাগুলির প্রথম আবির্ভাবকাল ১২২০-২৪ সাল হওয়া সম্ভব ।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সপ্তপঞ্চাশত্তম বার্ষিক কার্যবিবরণ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ৫৭শ বর্ষ অতিক্রম করিয়া ৫৮শ বর্ষে পদার্পণ করিল। নিম্নে পরিষদের ৫৭শ বর্ষের কার্যবিবরণ সংক্ষেপে পর্য্যালোচিত হইতেছে।

বান্ধব—বর্ষশেষে পরিষদের একজন মাত্র বান্ধব আছেন,—রাজা শ্রীনরসিংহ ঈশদেব বাহাদুর।

সদস্য—১৩৫৭ বঙ্গাব্দের শেষে পরিষদের বিভিন্ন শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা :—

বিশিষ্ট সদস্য—১। আচার্য্য শ্রীবহুনাথ সরকার, ২। আচার্য্য শ্রীবোগেশচন্দ্র রায়, ৩। ডক্টর শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৪। শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়, ৫। শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

আজীবন সদস্য—রাজা শ্রীগোপাললাল রায়, ২। শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, ৩। শ্রীগণপতি সরকার, ৪। ডক্টর শ্রীনরেন্দ্রনাথ সাহা, ৫। ডক্টর শ্রীবিমলাচরণ সাহা, ৬। ডক্টর শ্রীসত্যচরণ সাহা, ৭। শ্রীসজ্জনীকান্ত দাস, ৮-৯। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তদীয় সহধর্মিণী শ্রীমতী বীণাপাণি দেবী, ১০। শ্রীসতীশচন্দ্র বসু, ১১। শ্রীহরিহর শেঠ, ১২। ডাঃ শ্রীমেশনাদ সাহা, ১৩। শ্রীনেমিচাঁদ পাণ্ডে, ১৪। শ্রীলীলামোহন সিংহ রায়, ১৫। প্রশান্ত-কুমার সিংহ, ১৬। ডক্টর শ্রীরঘুবীর সিংহ, ১৭। শ্রীহিরণকুমার বসু, ১৮। শ্রীমুরারিমোহন মাইতি, ১৯। শ্রীঅমিয়লাল মুখোপাধ্যায়, ২০। রাজা শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়, ২১। শ্রীসমীরেন্দ্রনাথ সিংহ রায়, ও ২২। শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায়।

অধ্যাপক-সদস্য—বর্ষশেষে ৫ জন। সহায়ক-সদস্য—বর্ষশেষে ১০ জন।

সাধারণ-সদস্য—বর্ষশেষে কলিকাতা ও মফঃস্বলবাসী সদস্যের সংখ্যা ৭৫৩ জন।

পরলোকগত সাহিত্যসেবিগণ—শ্রীঅরবিন্দ, কমলচন্দ্র নাগ, তুলসীদাস কর, নিরুপমা দেবী, পরিমল মুখোপাধ্যায় ও জ্ঞানেশচন্দ্র রায়।

পরলোকগত সদস্যগণ—(ক) কালীকৃষ্ণ রায়, কৃষ্ণধন সাধু ষাঁ, নগেন্দ্রচন্দ্র নাগ, বঙ্কিমবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজবল্লভ রায় ও রমেশচন্দ্র দাশগুপ্ত। (খ) ভূতপূর্ব সদস্যগণ : ওয়াজেদ আলী, বিজেন্দ্রনাথ ভাট্টা, নলিনীমোহন সান্যাল, ব্রজেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, ভূতনাথ মুখোপাধ্যায় ও হারশঙ্কর পাল।

এতদ্ব্যতীত পরিষদের ভূতপূর্ব প্রধান কর্মচারী রামকমল সিংহ গত ১২ই চৈত্র ১৩৫৭ তারিখে পরলোকগমন করেন। তাঁহার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপি প্রদর্শনার্থ গত ৭ই বৈশাখ ১৩৫৮ তারিখে এক বিশেষ অধিবেশন হয়।

অধিবেশন—আলোচ্য বর্ষে এই কয়টি সাধারণ অধিবেশন-হইয়াছিল। (ক) বহু-পঞ্চাশত্তম বার্ষিক অধিবেশন—৯ই অগ্রহায়ণ ১৩৫৭; (খ) সারকুলার রোডস্থ সমাধিক্ষেত্রে কবির মধুসূদন দত্তের স্মৃতি-পূজা—১৪ই আষাঢ় ১৩৫৮; (গ) প্রথম মাসিক অধিবেশন—২১এ পৌষ ১৩৫৭; দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন—২০এ মাঘ ১৩৫৭; তৃতীয় মাসিক অধিবেশন—১৯এ ফাল্গুন ১৩৫৭; চতুর্থ মাসিক অধিবেশন ও বঙ্কিমচন্দ্র-স্মৃতিবার্ষিকী—

৩৪ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সপ্তপঞ্চাশত্তম বার্ষিক কার্যবিবরণ

২৬এ চৈত্র ১৩৫৭; ৫ম মাসিক অধিবেশন—২১এ বৈশাখ ১৩৫৮; ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন—২৫এ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৮; সপ্তম মাসিক অধিবেশন—২২এ আষাঢ় ১৩৫৮।

কার্যালয় : সভাপতি—শ্রীম্মীলকুমার দে; গত ২৬এ চৈত্র পদত্যাগ করিলে অষ্টম সহকারী সভাপতি মহারাজা শ্রীশ্রীচন্দ্র নন্দী বাহাদুর সভাপতির পদে নির্বাচিত হন।
সহকারী সভাপতি—আচার্য্য শ্রীযত্ননাথ সরকার, শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত, মাননীয় শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ, রাজা শ্রীবীরেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর, শ্রীতারাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসজ্জনীকান্ত দাস, মহারাজা শ্রীশ্রীচন্দ্র নন্দী বাহাদুর; তাঁহার শূন্য স্থানে শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। সম্পাদক—শ্রীরজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সহকারী সম্পাদক—শ্রীম্মলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ, শ্রীত্রিদিবনাথ রায় ও শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত। পত্রিকাধ্যক্ষ—শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। গ্রন্থাধ্যক্ষ—শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। কোষাধ্যক্ষ—শ্রীগণপতি সরকার। চিত্রশালাধ্যক্ষ—শ্রীচিত্তাহরণ চক্রবর্তী। পুথিশালাধ্যক্ষ—শ্রীদুর্গামোহন ভট্টাচার্য্য।

কার্যনির্বাহক-সমিতি—(ক) সদস্য-পক্ষে : ১। শ্রীঅশুতোষ ভট্টাচার্য্য, ২। রেভাঃ ফাদার এ দৌতেন, ৩। শ্রীকামিনীকুমার কর রায়, ৪। শ্রীক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৫। শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ৬। শ্রীজগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ৭। শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৮। শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, ৯। শ্রীপুলিনবিহারী সেন, ১০। শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, ১১। শ্রীবিজ্ঞানবিহারী ভট্টাচার্য্য, ১২। শ্রীমনোমোহন ঘোষ, ১৩। শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, ১৪। শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র বাগল, ১৫। শ্রীরবীন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত, ১৬। শ্রীলীলামোহন সিংহ রায়, ১৭। শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, ১৮। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহরায়, ১৯। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষাল, ২০। শ্রীসমীরেন্দ্রনাথ সিংহ রায়। (খ) শাখা-পরিষদ পক্ষে : ২১। শ্রীঅজিতকুমার বসু মল্লিক, ২২। শ্রীঅতুলচন্দ্র দে, ২৩। শ্রীমনীষিনাথ বসু সরকার ২৪। শ্রীম্মদীন দাশগুপ্ত।

নির্দিষ্ট কার্য ব্যতীত কার্যনির্বাহক-সমিতি নিম্নলিখিত বিশেষ কার্যগুলি সম্পাদন করিয়াছেন।

১। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্নলিখিত পদক ও পুরস্কার-সমিতিতে পরিষদের পক্ষে যে যে সদস্য প্রতিনিধি নির্বাচিত হইয়াছেন, তাঁহারা; (ক) কমলা বস্তুতা—শ্রীসজ্জনীকান্ত দাস, (খ) গিরিশচন্দ্র ঘোষ বস্তুতা—শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, (গ) শরৎচন্দ্র পদক ও পুরস্কার—শ্রীবিজ্ঞানবিহারী ভট্টাচার্য্য, (ঘ) জগত্তারিণী পদক—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, (ঙ) সরোজিনী পদক—শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা।

২। আচার্য্য শ্রীযত্ননাথ সরকারের অশীতিতম বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে বঙ্গীয়-ইতিহাস-পরিষদ যে সধর্জনার আয়োজন করেন, তাহাতে পরিষৎ এক বাণী পাঠাইয়াছিলেন।

৩। বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকগণের লেখা বাঙ্গলায় অমূল্যবাদ করা প্রয়োজনীয় ও বাঞ্ছনীয়; এই প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

৪। বঙ্গীয়-গ্রন্থাগার-পরিষদের আয়ত্নে, পরিষৎ ইহার সদস্য-শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন।

৫। নয় দিল্লীতে ভারত-সরকারের শিক্ষা-বিভাগ যে বিধ্বংস সম্মিলন আহ্বান করেন, তাহাতে পরিষদের প্রতিনিধি ডক্টর শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য যোগদান করেন।

৬। কলিকাতা ছোট আদালতের বার্ষিক প্রদর্শনীতে এবং কৃষ্ণনগর-সাহিত্য-সঙ্গীতি 'অন্নদামঙ্গল' রচনার দুই শত বৎসর পুষ্টি উৎসব উপলক্ষে যে প্রদর্শনীর আয়োজন করেন, তাহাতে পরিষদের কতকগুলি পুস্তক ও পুঁথি প্রেরিত হইয়াছিল।

৭। পরিষদের নিয়মাবলী নিঃশেষিত হওয়ায় ইহা পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা—আলোচ্য বর্ষেও সপ্তপঞ্চাশত্তম ভাগ পত্রিকা দুইটি যুগ্ম-সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

পুথিশালা—বর্ষশেষে মোট পুথির সংখ্যা ৫৯২০। এতদ্ব্যতীত সম্প্রতি (শ্রাবণ ১৩৫৮) নটবর দত্ত ভক্তিবিনোদের যে গ্রন্থসংগ্রহ পরিষদে আগিয়াছে, তাহাতে কতকগুলি পুঁথি আছে; সেগুলি এখনও শুছাইতে পারা যায় নাই।

বহু অল্পসঙ্খিৎ প্রাচীন সাহিত্য বিষয়ে গবেষণা করিবার জন্য পুথিশালা ব্যবহার করিয়াছেন।

রমেশ-ভবন—ইহার সম্পূর্ণ দ্বিতলটি রেশনিং আপিসরূপে এবং নিম্নতলের দক্ষিণ দিকস্থ বারান্দা সাহিত্য-পরিষৎ পোষ্ট অফিসরূপে ব্যবহৃত হইতেছে। নিম্নতলের হল-দ্বয়টিতে চিত্রশালার জব্যাদি যথাসম্ভব সাজাইয়া শুছাইয়া রাখা হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে কবি বিহারিলাল চক্রবর্তীর অল্পতম পুত্র ডাঃ শ্রীবেণীমাধব চক্রবর্তী, জ্যোতিরিজ্ঞানাধ-পত্নী কাদম্বরী দেবীর রচিত 'সাধের আসন'খানি পরিষদের চিত্রশালায় দান করিয়াছেন।

পশ্চিম-বঙ্গ সরকারের বদান্ধতা—"Journals" প্রকাশ বাবদ পশ্চিমবঙ্গ-সরকার ২০০০ টাকা দান করিয়াছেন। গ্রন্থ-প্রকাশের জন্য বার্ষিক সাহায্য ১২০০ টাকাও পাওয়া গিয়াছে।

গ্রন্থাগার—আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থাগারে ২৩২ খানি পুস্তক ও পত্রিকা (ক্রীত ১২৯ ও উপহারপ্রাপ্ত ১০৩) সংযোজিত হইয়াছে। সংগৃহীত পুস্তকগুলির মধ্যে 'মেঘনাদবধ কাব্য'র আক্ষরিক অম্বুবাদ 'The Fall of Meghnad' (1899) উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত শ্রীনিতাইদাস দত্ত তাঁহার পরলোকগত পিতা নটবর দত্তের গ্রন্থসংগ্রহ পরিষৎ-গ্রন্থাগারে দান করিয়াছেন।

পরিষৎ-গ্রন্থাগারের পুস্তক-পত্রিকা সঞ্চালনের কার্য অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। আশা করা যায় পশ্চিম-বঙ্গ-সরকারের বদান্ধতায় এই কার্য শীঘ্র সুসম্পন্ন করা সম্ভব হইবে।

আলোচ্য বর্ষেও বহু অল্পসঙ্খিৎ পাঠককে পরিষৎ-গ্রন্থাগারের হুজুপ্য গ্রন্থ ও সাময়িক-পত্র আলোচনা করিবার সুবিধা দেওয়া হইয়াছিল।

গ্রন্থপ্রকাশ—সাধারণ তহবিলের অর্ধে (ক) রামেশ্বর-রচনাবলীর ৫ম খণ্ড; (খ) শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-লিখিত 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা'র ৮৩ সংখ্যক পুস্তকে চন্দ্রনাথ বসু, নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, ও ক্ষেত্রমোহন সেন গুপ্তের জীবনী; (গ) শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসুর 'স্বপ্ন' তৃতীয় সংস্করণ ও 'পুরাণ প্রবেশ' দ্বিতীয় সংস্করণ; (ঘ) হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'বৌদ্ধ গান ও দোহা'র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

ঝাড়গ্রাম গ্রন্থ-প্রকাশ তহবিলের অর্ধে (ক) পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাবলীর প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড; (খ) রামমোহন গ্রন্থাবলীর প্রথম ও পঞ্চম খণ্ড; (গ) বঙ্কিমচন্দ্রের 'ভূর্গেশনন্দিনী'র দ্বিতীয় সংস্করণ ও 'রজনী'র চতুর্থ সংস্করণ; (ঘ) মধুসূদনের 'বীরদাদ কাব্য'র চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

বিনয়কুমার সরকার গ্রন্থপ্রকাশ তহবিলের অর্থে ত্রিঋষাং ৭ দে-অনুদিত রিকার্ডের 'ধনবিজ্ঞানে'র মুদ্রণ প্রায় শেষ হইয়া আসিল।

কলিকাতা-পৌর-প্রতিষ্ঠান—পূর্ববৎ এবারও কলিকাতা-পৌর-প্রতিষ্ঠান পরিষৎ-মন্দিরের ট্যাক্স রেহাই দিয়াছেন; পরিষৎ এ জন্ত বিশেষ কৃতজ্ঞ। আলোচ্য বর্ষে তাঁহার কেবলমাত্র ১৯৪৭-৪৮ সালের জন্ত পরিষৎ-গ্রন্থাগারের পুস্তকাদি ক্রয় বাবদ ৫০০ টাকার সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন।

দুঃস্থ-সাহিত্যিক-ভাণ্ডার—আলোচ্য বর্ষে এই ভাণ্ডার হইতে চারি জন সাহিত্যিকের বিধবা-পত্নী ও একজন মহিলা সাহিত্যিককে নিয়মিত মাসিক সাহায্য দান করা হয়। এতদ্ব্যতীত শিল্প-সমালোচক বামিনীকান্ত সেনের বিধবা-পত্নীকেও সাহায্য দান করা হইয়াছে।

বঙ্কিম-ভবন—পরিষদের নৈহাটি-শাখার তত্ত্বাবধানে এই ভবন রক্ষিত হইতেছে। এই শাখার উদ্যোগে বঙ্কিম-সজীব জন্ম-বার্ষিকী, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বিজ্ঞানাগর স্মৃতিবার্ষিকী সম্পন্ন হইয়াছিল।

শাখা-পরিষৎ—আলোচ্য বর্ষে বিষ্ণুপুরে (বাঁকুড়া) একটি শাখা-পরিষৎ স্থাপিত হইয়াছে। ইহার সম্পাদক শ্রীমানিকলাল সিংহ।

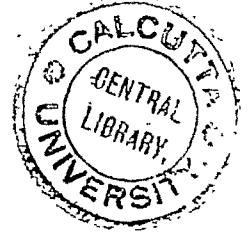
চিত্র-প্রতিষ্ঠা—আলোচ্য বর্ষে (১) মহিলা কবি মানকুমারী বসুর তৈলচিত্র গত ৯ই অগ্রহায়ণ ১৩৫৭ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। চিত্র-প্রদাতা—শ্রীচরুচন্দ্র নাগ, এবং (২) প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ও কথা-সাহিত্যিক হরিশাধন মুখোপাধ্যায়ের তৈল-চিত্র গত ২০এ মাঘ ১৩৫৭ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। চিত্র-প্রদাতা—শ্রীকলীভূষণ মুখোপাধ্যায়।

ব্রজেন্দ্র-গ্রন্থ-পুনঃপ্রকাশ তহবিল—এই তহবিলে আলোচ্য বর্ষে যে চাঁদা পাওয়া গিয়াছে তাহা—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল ২৫, শ্রীরবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ৫, শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত ৫।

উপসংহার—আমরা এত কাল আমাদের সাধ্যমত পরিষদের সেবা করিয়াছি—কত দূর কৃতকার্য হইয়াছি আপনাদেরই জ্ঞানেন। আমাদের তরফ হইতে এই কথা বলিতে পারি যে, নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতার অভাব কোন দিন হয় নাই। এখন আমরা বৃদ্ধ হইতে চলিয়াছি—যৌবনের শক্তি আর নাই। তরুণেরা আসিয়া আমাদের কর্মভার লাঘব করিবেন তাহার প্রতীক্ষা আছে। বর্তমানে গ্রন্থপ্রকাশ-বিভাগকে দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করাইয়া পরিষদের চিরন্তন আর্থিক সমস্যার অনেকটা সমাধান করিয়াছি বটে, কিন্তু জনসাধারণের সহিত যোগাযোগ, সদস্য-সংখ্যা বৃদ্ধি, নিয়মিত তাঁহাদের চাঁদা আদায় অপেক্ষাকৃত তরুণ ও কর্মক্ষম কর্মীদের উপর নির্ভর করিতেছে। তাঁহারা অগ্রণর হইয়া আসুন, আমরা তাঁহাদের হাতে ধীরে ধীরে পরিষৎ-পরিচালনার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব তুলিয়া দিয়া নিশ্চিত হই—ইহাই আমাদের একমাত্র কামনা। এক দিনে হঠাৎ আসিয়া কেহ দায়িত্বভার লইতে পারেন না, তাহার জ্ঞান শিক্ষা ও অভ্যবসায় প্রয়োজন। পরিষদের সকল বিভাগের কাজ একে একে পর্যবেক্ষণ করিয়া সমস্ত বুঝিয়া পড়িয়া লইবেন সদস্যদের মধ্য হইতে এইরূপ উদ্যোগী ও উত্তমশীল কর্মীদের আমি আজ সাদর আহ্বান জানাইতেছি। এই নিবেদনই আমার এত কাল সাহিত্য-পরিষদের সেবার চরম নিবেদন।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

৫৮শ বর্ষ, ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা



সূচি

১। মহাব্যক্তি—শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	...	৩৭
২। সংস্কৃত গ্রন্থকার অমর মৈত্রে—শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী	...	৩৯
৩। বৈজ্ঞানিকমঙ্গল—শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য	...	৪২
৪। ভাষ্যপর্বাচার্য—শ্রীঅনন্তলাল ঠাকুর	...	৫৩
৫। রেবন্ত—শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস	...	৫৭
৬। বেণুয়া-লিপির 'প্রমাণ'—শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত	...	৮২



পশ্চিমবঙ্গ সরকার-প্রদত্ত বহুসম্মানিত রবীন্দ্র-স্মারক-পুরস্কারপ্রাপ্ত

শ্রীব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী :

সংবাদপত্রে সেকালের কথা ১ম-২য় খণ্ড :

(তৃতীয় সংস্করণ)

মূল্য ১০ + ১২।০

সেকালের বাংলা সংবাদপত্রে (১৮১৮-৪০) বাঙ্গালী-জীবন

সহজে যে-সকল অমূল্য তথ্য পাওয়া যায়, তাহারই সম্বলন।

বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস : (৩য় সংস্করণ)

৫/-

১৭৯৫ হইতে ১৮৭৬ সাল পর্যন্ত বাংলা দেশের

সংস্করণ ও সাধারণ মঙ্গলকর প্রামাণ্য ইতিহাস।

বাংলা সাময়িক-পত্র : ১ম-২য় ভাগ

৫/- + ২।০

১৮১৮ সালে বাংলা সাময়িক-পত্রের জন্মাবধি বর্তমান

শতাব্দীর পূর্ণ পর্যন্ত সকল সাময়িক-পত্রের পরিচয়।

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা : ১ম-৮ম খণ্ড (১০খানি পুস্তক) ৪৫/-

আধুনিক বাংলা-সাহিত্যের জন্মকাল হইতে যে-সকল গুরুগন

সাহিত্য-সাধক ইহার উৎপত্তি, গঠন ও বিকাশে সহায়তা

করিয়াছেন, তাহাদের জীবনী ও গ্রন্থপঞ্জী।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ—২৪৩।১ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৬

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীসঞ্জীকান্ত দাস-সম্পাদিত

বন্ধিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী

সর্বাপেক্ষা প্রামাণিক সংস্করণ।

আচার্য বহুনাথ সরকার ঐতিহাসিক উপভাসগুলির ভূমিকা লিখিয়াছেন

বড় অক্ষরে ছাপা। আট বণ্ডে সম্পূর্ণ। মূল্য ষাট টাকা

দীনবন্ধু-গ্রন্থাবলী

ভূমিকা, পাঠভেদ ও দুইরকম শব্দের অর্থ সহ। দুই বণ্ডে সম্পূর্ণ। মূল্য আঠার টাকা

ভারতচন্দ্র-গ্রন্থাবলী

ভূমিকা, পাঠভেদ, দুইরকম শব্দের অর্থ ও টিগুনী সহ। মূল্য দশ টাকা

মধুসূদন-গ্রন্থাবলী

ভূমিকা, পাঠভেদ সহ। মূল্য আঠার টাকা

দ্বিজেন্দ্রলাল-গ্রন্থাবলী

কবিতা, গান ও হাসির গান। মূল্য দশ টাকা

শরৎকুমারী চৌধুরাণীর গ্রন্থাবলী

মূল্য সাড়ে ছয় টাকা

আলালের ঘরের দুলাল

মূল্য সাড়ে তিন টাকা

ছতোম প্যাঁচার নকশা

মূল্য সাড়ে চার টাকা

নূতন প্রকাশিত

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য-প্রণীত

বঙ্গালীর সারস্বত অবদান

প্রথম ভাগ—বঙ্গে নব্যন্যায়চর্চা

মূল্য দশ টাকা

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩১, আপার সারকুলার রোড,

কলিকাতা-৬

মহাব্যাহতি

শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্যাহতি সপ্তসংখ্যক—ভূবু, ভুববু, স্ববু, মহবু, জন, তপসু, সত্য। এই সপ্ত ব্যাহতি হাব্যাহতি নহে, ইহাদের অন্তর্গত ভূবু, ভুববু, স্ববু, এই তিনটি মহাব্যাহতি (মহু, ২, ৮১)। হু-প্রভৃতি সপ্ত লোক মহাব্যাহতি নহে, উহাদের অন্তর্ভূত ভূবু, ভুববু, স্ববু, এই তিনটি হাব্যাহতি হইল কেন? এই প্রশ্ন সহজেই মনে আসে। এই প্রশ্নের উত্তরে, হেয় বা উপায়ে বিচার না করিয়া, আমার সিদ্ধান্ত, কারণ নির্দেশ করিয়া নিবেদন করিব।

১। ঋগ্বেদের ১.১৬৪.৪০শ ঋকের সায়ণভাষ্য—“সর্ববৈদিকবাগ্জালস্ত সংগ্রহরূপা হুয়াদিস্তি। ব্যাহতিঃ,—অর্থাৎ সকল বৈদিক বাক্যসমূহের সংগ্রহরূপ অর্থাৎ সমবেত বা গন্ধিপ্ত ভাবে গ্রহণরূপ বা গৃহীত আকার ভূবাদি ত্রিসংখ্যক (ভূবু, ভুববু, স্ববু) ব্যাহতি। বৈদিক শব্দসমূহের সংগ্রহরূপ এই ব্যাহতিত্রয়ের মহত্বের কারণ এবং এই হেতু ভূবাদি মহাব্যাহতি নামে অভিহিত।

২। “প্রজাপতি (বিরাডাশ্বা) পৃথিব্যাং লোকের উদ্দেশে, অর্থাৎ পৃথিব্যাং হইতে রস গ্রহণের ইচ্ছায়, ধ্যানলক্ষণ তপস্তা করিলেন। তিনি তপস্তায় সেই লোকসমূহের রস (সার) উদ্ধৃত করিলেন এবং পৃথিবী হইতে সারভূত অগ্নি, অন্তরিক হইতে সারভূত বায়ু, ছালোক হইতে সারভূত আদিত্য উদ্ধৃত করিলেন। প্রজাপতি এই তিন দেবতার উদ্দেশে তপস্তা করিলেন। তিনি তপ্যমান সেই দেবতাদের রস উদ্ধৃত করিলেন এবং অগ্নি হইতে ঋকসমূহ, বায়ু হইতে যজুঃসমূহ, আদিত্য হইতে সামসমূহ উদ্ধৃত করিলেন। প্রজাপতি এই ত্রয়ী বিস্তার উদ্দেশে তপস্তা করিলেন। তিনি তপ্যমান দেবতাদের হইতে রস গ্রহণ করিলেন এবং ঋকসমূহ হইতে ভূবু, যজুঃসমূহ হইতে ভুববু, সামসমূহ হইতে স্ববু উদ্ধৃত করিলেন।”—ছান্দোগ্যোপনিষৎ, চতুর্থাধ্যায়, সপ্তদশ খণ্ড, ১, ২, ৩ মন্ত্র।

প্রজাপতি ধ্যানলক্ষণ তপস্তায় ত্রয়ী হইতে সারভূত রস এই ব্যাহতিত্রয় প্রথমে উদ্ধৃত করেন। মহরাদি লোকচতুষ্টয় পরে করিত ও তত্তদানন্তরে স্বর্গলোকের অন্তর্ভূত লোক। এই হেতু স্বরাদিত্রয় মহাব্যাহতি।

৩। অব্যয় অর্থাৎ অক্ষরব্রহ্মপ্রাপ্তিফলক ওঙ্কারপূর্বক ভূবু, ভুববু, স্ববু, এই মহাব্যাহতি এবং ত্রিপদা সাবিত্রী (গায়ত্রী) বেদেব মুখ অর্থাৎ আত্ম, অথবা পরমাত্মপ্রাপ্তির মুখ অর্থাৎ দ্বার জানিবে।—মহু, ২, ৮১।

বেদের আত্ম অর্থাৎ ওঙ্কারাদিপূর্বক স্বাধ্যায়রাজ হেতু অথবা পরমাত্মপ্রাপ্তির দ্বারস্বরূপ অর্থাৎ স্তবাদিপাঠ জপাদি দ্বারা মোক্ষপ্রাপ্তিহেতু ওঙ্কারপূর্বক ভূবাদি ত্রয় মহাব্যাহতি।

৪। প্রণববাহাবৃত্ত ব্যাকৃতিত্রয় মহাব্যাকৃতি। যথা, ও ভুঃ স্বাহা। ও ভুবঃ স্বাহা ও স্বঃ স্বাহা।—তবদেব ভট্ট (শব্দকল্পদ্রুম)।

৫। পুরাণে যে চতুর্দশ লোকের বর্ণনা আছে, তাহাদের মধ্যে ভূরাদি সপ্ত লোক উক্তলোক। ‘ত্রিলোকী’ শব্দের ‘ত্রিলোকে’র গণনায় স্বর্গ, অন্তরিক্ষ, পৃথবী, অথবা স্বর্গ, মর্ত্য পাতাল, এই তিন লোক গৃহীত হইয়াছে। এই গণনায় স্বর্গ, মহরাদি চতুষ্টির সহিত স্বর্লোক, অর্থাৎ মহরাদি ব্যাপক ভাবাপন্ন স্বর্গের বা স্বর্লোকের অন্তর্গত বিভাগবিশেষরূপে গণিত হইয়াছে; মহরাদি এইরূপ সংক্ষিপ্তভাবে স্বর্লোকের অন্তর্নিবিষ্ট। এই হেতু ভুবু, ভুববু, স্ববু, এই ব্যাকৃতিত্রয় মহাব্যাকৃতি।

৬। ইষ্টাপূর্ত্তে অর্থাৎ শ্রীত স্মার্ত্ত কার্যে স্বরাদি ব্যাকৃতিত্রয়ের ভূরি প্রয়োগ হয়। দ্বিতীয়তঃ, সপ্ত ব্যাকৃতি পূর্বোক্তরূপে সংক্ষেপে মহাব্যাকৃতির অন্তর্নিবিষ্ট হওয়ায়, মহাব্যাকৃতির পাঠে সপ্ত ব্যাকৃতির আত্মবল্লিক পাঠ হয়। এই হেতু ভূরাদি ত্রয় মহাব্যাকৃতি।

৭। ঋগ্‌যজুঃসামবেদীয় সঙ্খ্যাশ্রয়োণে ওঙ্কারপূর্বক সপ্ত ব্যাকৃতির পাঠ এবং ওঙ্কারপূর্বক মহাব্যাকৃতির পাঠও আছে। মনুসংহিতায় কেবল ওঙ্কারপূর্বক মহাব্যাকৃতি আছে। ইহাতে বোধ হয়, সপ্ত ব্যাকৃতি ভূরাদির অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া, ভূরাদির মহাব্যাকৃতি, এই সংজ্ঞা করা হইয়াছে।

সংস্কৃত গ্রন্থকার অমর মৈত্র

অধ্যাপক ত্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

কয়েক শত বৎসর পূর্ব হইতে প্রাদেশিক ভাষা ও সাহিত্যের সমৃদ্ধি ও প্রসার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত ভাষায় নূতন গ্রন্থরচনার প্রয়োজন কমিতে থাকে। বর্তমানে সেই প্রয়োজন একেবারে লুপ্ত হইয়াছে বলা যাইতে পারে। সংস্কৃতরসিক তথা সংস্কৃতব্যবসায়ী সমাজে প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ সংস্কৃত পুঁথিপঞ্জেরই পঠনপাঠনের প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। তথাপি সংস্কৃত রচনার একটা ধারা ক্ষীণ হইলেও প্রায় অব্যাহত ভাবেই এখন পর্যন্ত চলিয়া আসিতেছে— এখনও নানা বিষয়ে সংস্কৃত গ্রন্থ রচিত হইতেছে—বিভিন্ন স্থান হইতে সংস্কৃত পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে। যত বেশী অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, ততই এই ধারার পরিপুষ্টতর রূপের সন্ধান পাওয়া যায়। অথচ ইহার পরিচয় শিক্ষিত সমাজের নিকটও তেমন স্পষ্ট নয়। মুদ্রাযন্ত্র প্রবর্তনের পর যে সমস্ত গ্রন্থ রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাদেরও কোন ধারাবদ্ধ বিবরণ এ যাবৎ সংকলিত হয় নাই^১। সেই সময়ে বা তাহার পূর্বে রচিত যে সমস্ত গ্রন্থ এখনও অপ্ৰকাশিত অবস্থায় পুঁথির আকারে বিভিন্ন পুঁথিশালায় বা ব্যক্তি-বিশেষের গৃহে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, তাহাদের পরিচয়ই বা কবে কি ভাবে উদ্ধৃতি হইবে বলা যায় না। অনেক গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের সমস্ত স্মৃতিচিহ্ন ইতিমধ্যে বিলুপ্ত হইয়া যাইতে পারে। এই অবস্থায় কোন গ্রন্থ বা গ্রন্থকারের সন্ধান পাইলে তাহার যথাসম্ভব বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা বিশেষ উপযোগী হইবে। এই বিবেচনায় আমি পরিষদের পুঁথিশালায় কিছু দিন পূর্বে সংগৃহীত কয়েকখানি গ্রন্থ ও তাহাদের রচয়িতার সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে সংকলন করিয়া দিতেছি।

আলোচ্য গ্রন্থকারের নাম অমরচন্দ্র মৈত্র বা মৈত্রেয়। খ্রীষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে তাত্ত্বিক সাধনা ও যোগ বিষয়ে রচিত ইহার তিনখানি গ্রন্থের পুঁথি পরিষদের পুঁথিশালায় অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে (পরিষদের সংস্কৃত পুঁথি, সংখ্যা—১৮১৫, ১৮৩৫, ১৮৬৭)। এইগুলিতে গ্রন্থকারের যে পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইতে জানা যায়—ইনি গোড়দেশীয় বারেন্স ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইহার পিতার নাম ছিল বাসুদেব।^২ ইনি কাশীতে বসিয়া গ্রন্থ তিনখানি রচনা করেন। ইনি কাশীতে যাইয়া যোগাদি অভ্যাস করিয়া বহুশাস্ত্রজ্ঞ ও বহুশাস্ত্রাববোধক হইয়াছিলেন। ইনি বহু ভ্রম ও অন্ত্যস্ত গ্রন্থ আলোচনা করিয়া ‘জ্ঞানদীপিকা’ ও ‘আমরী সংহিতা’ রচনা করেন। আমরী সংহিতার প্রারম্ভে আলোচিত গ্রন্থের একটি

১। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রচিত কতকগুলি পুস্তক-উল্লেখ অ্যাডাম সাহেবের শিক্ষাবিষয়ক বিবরণে পাওয়া যায় (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-প্রকাশিত Reports on the state of education in Bengal by William Adam, পৃ. ২৫৯ প্রভৃতি)।

২। গোড়দেশীয় বারেন্স কুলোস্তবদাসদেবায়ন খ্রীষ্টীয় অমরচন্দ্র মৈত্রেয়বিরচিতাঃ জ্ঞানদীপিকায়া... হরোবিশ-প্রকাশঃ।

তালিকা দেওয়া হইয়াছে। এই তালিকায় মহানিৰ্বাণতন্ত্রের নাম সকলের আগে স্থাপিত হইয়াছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বহু শাস্ত্র আলোচনার ফলস্বরূপ এই গ্রন্থগুলি মাঝে মাঝে অতি সাধারণ ধরণের ভাষার ভুল পরিলক্ষিত হয়। ‘অমরসংগ্রহ’ নামক গ্রন্থ ইনি ইহার একখানি বাংলা গীতিকাব্যের উল্লেখ করিয়াছেন।* ইহা ছাড়া ইনি অল্প কোঁড়া রচনা করিয়াছিলেন কি না, জানিতে পারি নাই—ইহার বিস্তৃতভর পরিচয়ও সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

উল্লিখিত গ্রন্থ তিনখানির প্রত্যেকখানির শেষেই রচনাকাল দেওয়া হইয়াছে। তাহা হইতে জানা যায়—জ্ঞানদীপিকা রচিত হয় ১৭৫০ শকাব্দে* (১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে), অমরসংগ্রহ রচিত হয় ১৭৬৫ শকাব্দে* (১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে) এবং আমরী সংহিতা রচিত হয় ১৭৬৮ শকাব্দে (১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে)*।

পরিষদের পুথিশালায় ইহাদের যে তিনখানি পুথি সংগৃহীত হইয়াছে, সেগুলি শ্রামবাজার স্তায়রঙ্গ লেনের অক্ষয়কুমার গোস্বামী মহাশয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত। ইহাদের মধ্যে দুইখানি বঙ্গাক্ষরে লিখিত—আমরী সংহিতার পুথিখানি নাগরীতে লেখা। উৎকৃষ্ট কাগজে লিখিত চিত্রশোভিত জ্ঞানদীপিকার পুথির পাঠ্য উপরে লাগান এক টুকরা কাগজে গ্রন্থকারের পুত্রের নাম (রামরঙ্গ মৈত্র) উল্লিখিত হইয়াছে মনে হয়। প্রসঙ্গক্রমে ইহাদের আশ্রিতবাংসল্যের ইঙ্গিতও করা হইয়াছে।

জ্ঞানদীপিকা ২৩ প্রকাশ বা পরিচ্ছেদে সমাপ্ত। ইহাতে বিভিন্ন তাত্ত্বিক অঙ্কুষ্ঠানের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। গ্রন্থারম্ভে অঙ্কুষ্ঠমণিকায় প্রতি প্রকাশে আলোচিত বিষয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে*। ইহা তন্ত্রসারজাতীয় একটি বিস্তৃত তাত্ত্বিক নিবন্ধগ্রন্থ। বিগত

৩। অজ্ঞাত চরিতং গীতং ভাষয়া রচিতং মহা। গানং করোমি কাণ্ডাং বৈ প্রত্যহং হৃদনৈঃ সহ।

৪। শাকে ভূশরশৈলচন্দ্রগণিতে কোঁজে সিতে পক্ষকে
নীলসৈকান্তদিবসগতে ভূতসংজ্ঞা তিথৌ চ।
ধ্যাত্বা ত্রিগুণান্নিকং ভগ্নমরীং দুর্গাং দুর্গাপাং
শ্রীমুক্তাসরচন্দ্রমৈত্রবিনয়ী পূর্ণং কৃতং সংগ্রহম্।

৫। শাকে পঞ্চরসাত্রিচন্দ্রগণিতে বেবং গতে ভাস্করে
রাক্ষাং ভূতবাসরে।

হমরচন্দ্রগণকৃতিনা কৃষা চ গ্রন্থখণ্ডঃ

শ্রীমৎসজ্জনসমিধৌ হৃদয়লো ভক্ত্যা প্রকাশিতঃ।

৬। শাকে বহুরসাত্রীন্দো নীলসৈকান্তদিবসরে।

বিবেশন্ত প্রদাদ্য চ কাণ্ডাং হৃদনসমিধৌ।

৭। প্রকাশে প্রথমে বজ্জ্য দুর্গায়াহাস্যমুত্তমম্।

দ্বিতীয়ে ভাববধনং বীরব্যাখ্যা তৃতীয়কে।

চতুর্থে চাভিষেকক পঞ্চমে সন্ধিমাশনম্।

পুনস্ত্রয়েব বিজয়াধ্বংগ্রহণজং কলম্।

জাতা চ সংহিতা পূর্ণা সিতে ভূততিথৌ কুজে।

শ্রীপূর্ণাসরচন্দ্রেণ কৃত্য সজ্জনহেতবে।

প্রাতঃকৃত্যাদিকং সর্বং বদ্যবাস্তবকং বিধিঃ।

বর্ষপ্রকাশে তং সর্বং বধ্যা শঙ্করভাবিতম্।

প্রকাশে সপ্তমে সম্যক্ স্তানাদিকবিধিঃ ততঃ।

সদ্যাপ্রয়োগসকলং শিবপূজামনন্তরম্।

কয়েক শত বৎসরে বাংলা দেশে এ জাতীয় বহু গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীতে রচিত গ্রন্থের সংখ্যাও কম নহে। ইহাদের মধ্যে প্রাণতোষণী ও হরতত্ত্বদীপ্তি মুদ্রণসৌভাগ্য লাভ করিয়াছে।

অমরসংগ্রহ ১৮ পাদে সম্পূর্ণ। ইহার বিষয়সূচী এইরূপ—অগ্নিধাতুপ্রাকরণ, তত্ত্ববোধ প্রাকরণ, বিবেকবর্ণন, লয়যোগবর্ণন, নবচক্রবিবরণ, পিণ্ডজ্ঞানবিবরণ, যোগরহস্য, বটচক্রযোগ, পঞ্চায়র্যোগ, হঠযোগ, মুদ্রাপ্রাকরণ, ধারণা প্রাকরণ, রাজযোগ, জ্ঞানযোগ, ব্রহ্মমন্ত্রসাধন, সন্ন্যাসযোগ, কাম্যযোগ, কালজ্ঞান, বিপ্রলক্ষণ, সাংখ্যযোগ। গ্রন্থশেষে কতকগুলি শ্লোকে গ্রন্থে আলোচিত বিষয়ের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। পুষ্টিতে এই অংশের অনেকটা ছিঁড়িয়া গিয়াছে। এক দিন এক ব্রাহ্মণ গ্রন্থকারের নিকট উপস্থিত হইলে, তাঁহার হস্তস্থিত মহাভারতের একটি শ্লোকের ব্যাখ্যা অবলম্বন করিয়া গ্রন্থের সূচনা হয়। বিভিন্ন গ্রন্থ হইতে নানা প্রসঙ্গে অনেক বচন এই গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে।

আমরী সংহিতা চারি উপদেশে বিভক্ত। উপদেশগুলির মধ্যে আবার পরিচ্ছেদবিভাগ আছে। গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়—প্রথম উপদেশে সাংখ্যযোগবিধান, দ্বিতীয় উপদেশে মন্ত্রযোগবিধান, তৃতীয় উপদেশে ছয় পরিচ্ছেদে নাড়িকাঙ্কালন, আসন, প্রত্যাহার, প্রাণায়াম, ধারণা, ধ্যান প্রভৃতি হঠযোগবিধান, চতুর্থ উপদেশে সাত পরিচ্ছেদে পূজাপ্রয়োগাদি। গ্রন্থখানি বিংশের বন্য ও অমরচন্দ্রের কথোপকথনরূপে নিবদ্ধ। এক দিন বিংশের অমরচন্দ্রসকাশে উপনীত হইয়া, মুক্তিরূপের উপায় অজ্ঞসন্ধান করেন এবং ক্রম সিদ্ধিপ্রদ সাধন, মন্ত্রাদিসাধন ও আচার সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। অমরচন্দ্র বিবিধ তন্ত্র, পুরাণ ও অস্ত্রাঙ্গ গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া^৮ এ বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করেন।

গুরুপূজাবিধানঞ্চ শিবেন ভাবিতং যথা।

অষ্টমে ত্রিবিধা পূজা শিবশাস্ত্রস্ত সম্যতা।

নবমে বহুচক্রঞ্চ ভৈরবাচারি পৃথক্ পৃথক্।

দশমে বীরকর্তব্যাকর্তব্যমতিসূক্ষ্মম্ ॥

নিম্ননীয়ঃ পুনর্বীরঃ পানাবজ্ঞকতা তথা।

অস্তর্গজনতাকর্ষ তচ্চ রক্তপ্রকাশকে।

ত্রিভূর্ষে গৃহধর্মাদি প্রারম্ভস্তাদিকং তথা।

ত্রয়োদশপ্রকাশে চ পূর্ণাভিষেকনির্ণয়ম্ ॥

দ্বিসপ্তে চ কুমারীণাং পূজনং ফলদং মহৎ।

ত্রিগুণে চ লতাবোগসাধনং পরমাজুতম্ ॥

৮। মহানির্বাণতন্ত্রঞ্চ তন্ত্রং গর্ভবসংজ্ঞকম্।

গৌতমীয়ং তথা রক্তজামলং ব্রহ্মামলম্ ॥

শাকরং মুণ্ডালাখ্যং মুদ্রানীতজমুত্তমম্।

বোগেবরোদয়ং নাম জ্ঞানভাস্তং কুলার্ণবম্ ॥

বোদ্ধশে চৈব বীর্যশাং বীরসাধনমুত্তমম্।

নানাবিধা পুরস্কর্যা তত্ত্বং সপ্তদশে হি বৈ।

অষ্টাদশপ্রকাশে চ জপাদীনং রহস্যকম্।

অখোনবিংশে যাবচ্চি মালাপ্রকরণাদিকম্।

বিংশে ত্রিলোকিকং মুদ্রাধ্বজসংস্কারমুত্তমম্।

ত্রিসপ্তে চৈব মোক্ষার্থিযোগপ্রকরণাদিকম্।

দ্বাবিংশতিপ্রকাশে চ তদ্রোক্তদণ্ডধারণম্ ॥

দশনামাবধূতং হি শিবেন কথিতং যথা ॥

ত্রয়োবিংশপ্রকাশে চ হংসাখ্যং চাবধূতবম্।

ব্রহ্মচিন্তাকলং তত্র নির্বাণফলদং মহৎ ॥

ষেরওসংহিতা চৈব তথা গৌরবসংহিতাম্।

দত্তাত্রেয়সংহিতাঞ্চ তথা পদ্মপুরাণকম্।

মার্কণ্ডেয়ং তথা ক্রমং মহাভারতমেব চ।

অস্ত্রানি বহুশাস্ত্রানি তদ্রূপাণি বিবিধানি চ।

শাস্ত্রাণ্যেতানি চালোকা সংক্ষেপাং কথয়ামি তে ॥

বৈষ্ণনাথমঙ্গল

অধ্যাপক শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য

বেদে শিবের নাম নাই। বেদে যিনি রুদ্র নামে প্রসিদ্ধ, তিনিই বহু শতাব্দী পবে কালক্রমে শিব নামে অভিহিত হইয়াছেন। বেদোক্ত রুদ্রের বহু গুণই শিবের উপর আরোপিত হইয়াছে। শিব ও রুদ্র এখন অভিন্ন। রুদ্র কি ভাবে শিবে রূপান্তরিত হইলেন, তাহার বিচিত্র ইতিহাস বর্তমান প্রবন্ধে আলোচনা সম্ভবপর নহে, প্রয়োজনীয়ও নহে।

শৈব, শাক্ত, সৌর, বৈষ্ণব প্রভৃতি বিভিন্ন ধারার মধ্যে শৈব ধারা সমগ্র ভারতে ছড়াইয়া আছে। শাক্ত তীর্থ যেমন ভারতের নানা স্থানে, তদ্রূপ শাক্ত তীর্থের পাশাপাশি শৈব তীর্থও সমগ্র ভারতব্যাপী বর্তমান। অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে শিব, স্বন্দ, লিঙ্গ, কুর্ঙ্গ, বামন, বরাহ, ভবিষ্য, মৎস্য, মার্কণ্ডেয় ও ব্রহ্মাণ্ড, এই দশখানি 'শৈব পুরাণ' নামে অভিহিত। ইহা হইতে শৈব ধারার প্রচার যে কত ব্যাপক, তাহাই অস্বত্ব হইবে।

বেদোক্ত রুদ্রের নানা গুণের মধ্যে 'রোগাপহারণ' গুণটি অস্বত্ব। ঋক্, যজুঃ ও অথর্ব বেদে রুদ্রের এই গুণের বহু উল্লেখ আছে (ঋক্, ১।১১৪ ১; শুক্লযজুঃ, ১৬।৪) আবার কোথাও কোথাও তিনি স্বয়ং রোগের ঔষধরূপেও পরিগণিত (ঋক্, ১।৪০৪, শুক্লযজুঃ, ১৬।৪৯) এই রুদ্রই আদি দেববৈষ্ণব—'প্রথমো দৈব্যো ভিষক্'—শুক্লযজুঃ, ১৬।৫। ইনি রোগদাতা ও রোগাপহারী, উভয় রূপেই কল্পিত।

বেদোক্ত রুদ্রের উল্লিখিত গুণসমূহই বিভিন্ন পুরাণে ও তন্মধ্যে শিবের গুণরূপে স্বীকৃত হইয়াছে। শিবপুরাণে শিবসহস্রনাম স্তোত্রে শিবের অস্বত্ব নাম হিসাবে 'ধ্বংসরি' নামের উল্লেখ আছে। ধ্বংসরি দেববৈষ্ণব, ইনি রোগাপহারী (শিবপুরাণ, ধ্বংসংহিতা, ২৮।৬১)। উক্ত সহস্রনাম স্তোত্রটি নামীর গুণহেতু পাঠকদের পক্ষে আরোগ্যকর ও আয়ুষ্কর (ঐ, ২৮।১৬৩)। বেদোক্ত 'দৈব্যো ভিষক্' রুদ্র যেক্রূপে 'ভেষজী' অর্থাৎ স্বয়ং ঔষধরূপে, তদ্রূপ পুরাণেও তিনি 'মহৌষধি'রূপে কল্পিত (ঐ, ২৬।৬৮) হইয়াছেন। শিবের আরাধনা করিলে শিবভক্তরা সকল প্রকার ব্যাধি হইতে মুক্ত হন (শিবপুরাণ, সনৎকুমারসংহিতা, ১৪ ১১৯, স্বন্দপুরাণে নীলকণ্ঠ-সুবরাজ দ্রষ্টব্য।)

রুদ্র যেক্রূপ কালক্রমে শিবে রূপান্তরিত হইয়াছেন, তদ্রূপ এই শিবেরও অস্বত্বরূপ 'বৈষ্ণনাথ'। বৈষ্ণনাথ শিবের উল্লেখ একাধিক তন্ত্রে ও পুঁথিতে আছে (মহালিঙ্গেশ্বর-স্তোত্রোক্ত শিবশতনামস্তোত্র দ্রষ্টব্য)। বেদোক্ত দৈব ভিষক্ রুদ্র, পুরাণোক্ত 'আরোগ্য ও আয়ুদাতা,' 'সর্বব্যাবিপ্রশমনকারী' শিবই কালান্তরে বৈষ্ণনাথ নামে অভিহিত হইয়াছেন। বৈষ্ণনাথ শিবের অবস্থিতিস্থল 'বৈষ্ণনাথ' বা 'বৈষ্ণনাথধাম' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। দক্ষযজ্ঞের পর সতীর দেহভ্যাগ ঘটিলে, বিষ্ণু শিবরূপস্থিত সতীদেহে অদর্শন চক্রে দ্বারা ধুও ধুও

করেন। ৫২ ক্ষেত্রে সতীর দেহখণ্ড পতিত হওয়ায় ৫২ পীঠের উৎপত্তি হইয়াছে। তন্ত্রচূড়ামণির পীঠনির্ণয় প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে যে, বৈজ্ঞানাথে সতীর হৃদয় পতিত হয়। উক্ত পীঠস্থ ভৈরব বৈজ্ঞনাথ। “হাদ্দিপীঠং বৈজ্ঞানাথে বৈজ্ঞনাথস্ত ভৈরবঃ।” মৎস্তপুরাণের মতে এই পীঠস্থানের শক্তির নাম—‘অরোগা’।

অরোগা বৈজ্ঞানাথে তু মহাকালে মহেশ্বরী।

(মৎস্তপুরাণ, ১৩ অঃ, ৪১ শ্লোক)।

বৈজ্ঞনাথপীঠস্থ দেবমূর্তির নাম ‘অরোগা’ হইতে ইহাই অমৃত হইতেছে যে, রোগাপহারী বৈজ্ঞনাথের শুণ পীঠস্থ দেবীমূর্তির উপরও আরোপ করা হইয়াছে।

বৈজ্ঞনাথের মাহাত্ম্যসূচক একখানি বাংলা মঙ্গলকাব্য পাইয়াছি। এই গ্রন্থ ‘বৈজ্ঞনাথ-মঙ্গল’ নামে প্রসিদ্ধ। বর্তমান প্রবন্ধে ‘বৈজ্ঞনাথমঙ্গল’রই সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইল।

পুথির পরিচয়

বৈজ্ঞনাথমঙ্গলের ১১খানি পুথির সন্ধান পাওয়া বাইতেছে, যথা :—

[১] শ্রীহট্ট জেলার সিঙ্গেরকাছ গ্রামের সদানন্দ ও জয়চূর্ণা গ্রন্থাগারে রক্ষিত পুথি—

‘ক’ পুথি—ইহার পত্রসংখ্যা ১-২৬, পুথিখানি সম্পূর্ণ, লিপিকাল ১২৬৯ বাং ২৩ জ্যৈষ্ঠ, প্রদাতা—পুলিনবিহারী শীল, শ্রীহট্ট মহর।

‘খ’ পুথি—ইহার পত্রসংখ্যা ১-৪২, পুথিখানি সম্পূর্ণ, লিপিকাল ১২৭০ বাং, প্রদাতা—রামানন্দ নাথ, খামিনগর, তুমাবহর, শ্রীহট্ট।

‘গ’ পুথি—ইহার পত্রসংখ্যা ১-৩০, ৩৫-৪২, পুথিখানি খণ্ডিত, লিপিকাল অজ্ঞাত, প্রদাতা—অমরচন্দ্র ভট্টাচার্য, দেশমূল্যপাড়া, বাণিয়াচঙ্গ, শ্রীহট্ট।

‘ঘ’ পুথি—ইহার পত্রসংখ্যা ২-২৩, পুথিখানি খণ্ডিত, লিপিকাল অজ্ঞাত, প্রদাতা—তারকচন্দ্র চৌধুরী, সিঙ্গেরকাছ, শ্রীহট্ট।

‘ঙ’ পুথি—ইহার পত্রসংখ্যা ১-১৯, পুথিখানি খণ্ডিত, লিপিকাল অজ্ঞাত, প্রদাতা—অমরচন্দ্র ভট্টাচার্য, দেশমূল্যপাড়া, বাণিয়াচঙ্গ, শ্রীহট্ট।

‘চ’ পুথি—ইহার পত্রসংখ্যা ১-৪২, পুথিখানি সম্পূর্ণ, লিপিকাল ১২১৭ বাং, প্রদাতা—দয়াল রায় চৌধুরী, বনভাগ, মোতাপুর, শ্রীহট্ট।

[২] শ্রীহট্ট সাহিত্য-পরিষদগ্রন্থাগারে রক্ষিত পুথি :—

‘ছ’ পুথি—ইহার পত্রসংখ্যা ১-২২, পুথিখানি সম্পূর্ণ, লিপিকাল ১২২৭ বাং, প্রদাতা—সতীশচন্দ্র দেব বি. এল. লাউতা, করিমগঞ্জ, শ্রীহট্ট। পুথির ক্রমিক সংখ্যা ২৭।

[৩] শিলচর নর্মাল স্কুলে রক্ষিত পুথি :—

‘জ’ পুথি—ইহার পত্রসংখ্যা ১-২, পুথিখানি খণ্ডিত, লিপিকাল অজ্ঞাত, প্রদাতা—জগন্নাথ দেব বি. এ., বি. টি., সুনামগঞ্জ, শ্রীহট্ট। পুথির ক্রমিক সংখ্যা ১৭০।

[৪] রাজসাহী, বরেন্দ্র অল্পসন্ধান সমিতির গ্রন্থাগারে রক্ষিত পুঁথি :—

‘অ’ পুঁথি—ইহার পত্রসংখ্যা ১-২৬, পুঁথিখানি সম্পূর্ণ, লিপিকাল ১২৪৫ বাৎ বৈশাখ, প্রমোদ—গিরিশচন্দ্র বিজ্ঞানব, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ত্রিপুরা। পুঁথির ক্রমিক সংখ্যা ১৩৬৮।

[৫] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত পুঁথি :—

‘ক’ পুঁথি—পত্রসংখ্যা ১-২২, পুঁথিখানি সম্পূর্ণ, লিপিকাল ১২১০ বাৎ, “নিজ পুস্তক শ্রীরাজকিশোর দাস, সাকিন পরগণে আশানগিরি” [শ্রীহট্ট], পুঁথির ক্রমিক সংখ্যা ১৩৩০।

[৬] বিশ্বকোষ কার্যালয়ে রক্ষিত পুঁথি :—

‘ট’ পুঁথি—বিশ্বকোষ-সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়, বিশ্বকোষ কার্যালয়ে সংগৃহীত ৩৫৯ খানি পুঁথির সংক্ষিপ্ত পরিচয়, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকার ১৩০৫ বঙ্গাব্দের চতুর্থ সংখ্যায় ও ১৩০৬ বঙ্গাব্দের প্রথম সংখ্যায়—‘বাঙ্গালা পুঁথির সংক্ষিপ্ত বিবরণ’ শীর্ষক প্রবন্ধে প্রকাশ করিয়াছেন। এই প্রবন্ধের ১৭৫ সংখ্যক পুঁথি বৈজ্ঞান্যমঙ্গল। গ্রন্থরচয়িতা—অন্নর বিজ্ঞ, লিপিকাল ১২১০ বাৎ ২ ভাদ্র, শ্লোকসংখ্যা ৯০০। এই গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে গিয়া, গ্রন্থের আরম্ভ, ভণিতা ও শেষ অংশ হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন।

কবির পরিচয়

কবি জ্ঞাতিতে ব্রাহ্মণ, তাঁহার পিতার নাম হরিহর, নিজের নাম বিজ্ঞ অন্নর, সম্ভবতঃ নামান্তর মণিরাম ছিল। সমগ্র গ্রন্থের অধিকাংশ স্থলে ‘অন্নর রায়’ বা ‘অন্নর বিজ্ঞ’ এইরূপ ভণিতাই দৃষ্ট হয়। যাত্রা এক স্থলে ‘অন্নর রায়’ ভণিতা পাইতেছি। উক্ত গ্রন্থের দুই জায়গায় ‘বিজ্ঞ মণিরাম’ ভণিতা আছে।

উপরে উল্লিখিত ‘গ’ ও ‘ঙ’ পুঁথিতে অন্নর রায় ও অন্নব বিজ্ঞ স্থলে শঙ্কর রায় ও শঙ্কর বিজ্ঞ পাঠ আছে। ১৮শ ভাগ বিশ্বকোষে ‘বাঙ্গালা সাহিত্য—শৈব প্রভাব’ অংশে বিজ্ঞ হরিহরস্বত শঙ্কর-রচিত বৈজ্ঞান্যমঙ্গল হইতে সাত পংক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে। এই পংক্তিসমূহক ভাঃ মুকুন্দর সেন-রচিত ‘বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস’ গ্রন্থেও পুনরুদ্ধৃত হইয়াছে। ভাঃ দীনেশচন্দ্র সেন-রচিত বঙ্গভাষা ও সাহিত্য গ্রন্থে শঙ্করস্বত বৈজ্ঞান্যমঙ্গলের উল্লেখ আছে। অধিকাংশ পুঁথিতে ‘অন্নর’ পাঠ পাওয়ার উক্ত পাঠই আদর্শ পাঠরূপে গৃহীত হইল। লিপি-প্রমাদবশতঃ, অধিকন্তু ‘বসেন অন্নর রায় শঙ্করচরণে’ পাঠের ‘শঙ্কর’ শব্দের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া ‘অন্নর’কে ‘শঙ্কর’ পাঠ করা বিচিত্র নহে। ১৯ ভাগ বিশ্বকোষে হরিহরস্বত মুকুন্দ বিজ্ঞ-বিরচিত বৈজ্ঞান্যমঙ্গল নামক ভাষা-গ্রন্থের উল্লেখ আছে এবং তদগ্রন্থ হইতে অংশবিশেষ উদ্ধৃতও হইয়াছে। আমরা অল্প কোথাও ‘মুকুন্দ বিজ্ঞ’ পাঠ পাইতেছি না। ইহা লিপিপ্রমাদ বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

বিজ্ঞ অন্নর কোথাও নিজের পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই। তাঁহার একটি উক্তি-তে তিনি দারিদ্র্যবশতঃ বৈজ্ঞান্যমঙ্গল বঙ্কিত বলিয়া আক্ষেপ করিতেছেন :—

সংসারে জন্মিয়া মোকে বাম হৈল বিধি।

ভাগ্যবশ্তে দেখে গিয়া প্রভু গুণনিধি ॥

৭ম স্তোত্র—

প্রভুর মহিমা শুনি মনে লাগে সুখ।

চক্ষু ভরি না দেখিছু হেম চন্দ্রমুখ ॥

কবির বাসস্থান

বিশ্বকোষ কার্যালয়ে সংগৃহীত পুস্তকখানি ব্যতীত অপর যে দশখানি পুঁথি দেখিয়াছি, তন্মধ্যে মাত্র একখানি পুঁথির লিপি-স্থল ত্রিপুরা জেলা (‘ব’ পুঁথি), অপর নয়খানিরই লিপি-স্থল শ্রীহট্ট জেলা। একমাত্র শ্রীহট্ট জেলা হইতে নয়খানি পুঁথি আবিষ্কৃত হওয়ায় এই কাব্যের প্রচার শ্রীহট্টেই সর্বাধিক, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে।

কবির বাসস্থানের উল্লেখ তাঁহার কাব্যের কোথাও নাই। গ্রন্থে ব্যবহৃত ভাষা লক্ষ্য করিলে কবিকে পূর্ববঙ্গের লোক বলিয়াই অনুমিত হয়। এই কাব্যে যে সকল ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা এখনও অল্পরূপ ভাবে শ্রীহট্ট অঞ্চলে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। দৃষ্টান্ত যথা :—মাণ্ড, যাইয়ু, দেয়ু, পুজিয়ু, নারিয়ু, হইয়ু, যাউকা, থৈয়ু, বলিয়ু ইত্যাদি।

শ্রীহট্ট জেলার মৌলবীবাড়ার মহকুমার গয়গড়নিবাসী কবি যশীদর দত্তের পদ্মাপুরাণের সঙ্গে বৈজ্ঞানিকমঙ্গলের অংশবিশেষের সাদৃশ্য রহিয়াছে। বৈজ্ঞানিকমঙ্গলের কবি শ্রীহট্টবাসী হইলে একই জেলার এক কবির প্রভাব অল্প কবির উপর পড়া খুবই স্বাভাবিক।

গ্রন্থরচনাকাল

গ্রন্থের কোথাও ইহার রচনাকালের উল্লেখ নাই। গ্রন্থকার কোথাকার এবং কোন্ সময়ের, এই উভয় প্রশ্নেরই উত্তর দেওয়া দুঃস্বপ্ন। বৈজ্ঞানিকমঙ্গলের যে সকল হস্তলিখিত পুঁথি সংগৃহীত হইয়াছে, তন্মধ্যে লিপিকালের উল্লেখযুক্ত পুঁথি কয়খানির মধ্যে ১২১০ বঙ্গাব্দের পুঁথিখানি (‘এ’ পুঁথি) প্রাচীনতম। এই তারিখ হইতে কবি অষ্টাদশ শতাব্দী বা তৎপূর্বের লোক ছিলেন বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে।

গ্রন্থের বিষয়বস্তু

আলোচ্য বৈজ্ঞানিকমঙ্গল কাব্যেও বৈজ্ঞানিকের ‘রোগাপহারণ’ গুণই বিশেষ ভাবে স্বীকৃত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত যথা :—

[ক] অন্ধ রোগী জরা ব্যাধি কুণ্ঠিত বিখ্যাত।

দরশন মাঝে মুক্ত করে জগন্নাথ ॥

[খ] রোগ কোটি নাশ করে বৈজ্ঞানিক ঝায় ॥

[গ] রোগ ব্যাধি নাশ করে বৈজ্ঞানিক ঝায় ॥

[ঘ] জ্বাল পাইয়া রোগ ব্যাধি পলাই দ্বরিতে ॥ ইত্যাদি।

বৈজ্ঞান্যের মাহাত্ম্যজ্ঞাপক যে ছয়টি কাহিনী বর্তমান কাব্যে পাইতেছি, তন্মধ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় কাহিনী হইতে জানা যায় যে, বৈজ্ঞান্যের কুপায় দুই রক্তবাতরোগী রোগমুক্ত হইয়াছিল। কাহিনী হইতে জানিতে পারি যে, বৈজ্ঞান্যের অল্পগ্রহে অল্প চক্ষুস্থান হয় এই সকল কাহিনী দ্বারা বৈজ্ঞান্যের রোগনাশক্ষমতাই বিশেষভাবে কীর্তিত হইয়াছে আলোচ্য কাব্যের বৈজ্ঞান্য শুধু রোগাপহারীই নহেন, অধিকন্তু ইনি ধনদাতা। উক্ত কাব্যের পঞ্চম কাহিনীতে বৈজ্ঞান্যের ‘ধনদাতা রূপ’ই বর্ণিত হইয়াছে। চতুর্থ কাহিনী বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ইহাতে জানা যায়, সতীর সত্যীত্বনাশকারী দুারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া, রোগমুক্তি কামনায় বৈজ্ঞান্যের আরাধনা করিলে, তিনি তাহাকে তদবস্থায় বিতাড়িত করেন। এই কাহিনী দ্বারা লেখক ইহাই প্রচার করিতে চাহিয়াছেন যে, পরদায়রত লম্পটের পাপের ক্ষালন কিছুতেই হয় না। ইহা হইতে লেখকের সমাজহিত-কারী মনেরই পরিচয় পাওয়া যায়। নিম্নে বৈজ্ঞান্যের মাহাত্ম্যজ্ঞাপক ছয়টি কাহিনীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইল।

[১] রাবণকাহিনী

মহাভারত শ্রবণে বিগতপাপ জন্মেজয়ের রাজসভায় এক দিবস ব্যাস মুনি আসিয়া উপস্থিত হইলে জন্মেজয় তাঁহাকে যথারীতি বন্দনান্তর বলিলেন,—

মুনি এক নিবেদন শুন তপোধন।

বৈজ্ঞান্যমদলকথা শুনি অমুক্ষণ ॥

কেমনেতে দশানন আনিল শরয়।

কেমনেতে পথে আসি রৈল দিগম্বর।

জন্মেজয়ের প্রশ্নের উত্তরে ব্যাস বলিলেন যে, রামের সভাতে এক দিবস দুর্কাসা আসিয়া উপস্থিত হইলে রাম তাঁহাকে বন্দনা করিয়া সভায় আগমনের উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করিলে দুর্কাসা রামের প্রশংসা করিয়া বলিলেন,—

ভকতবৎসল তুমি পতিতপাবন ॥

সাগর বহ্নন করি রাবণ বধিলা।

অক্ষয় জটা মিলিছিল তাকে হেদিলা ॥

দুর্কাসার বাক্য শ্রবণ করিয়া রাম বলিলেন—

কি কারণে অক্ষয় জটা মিলিল রাবণ।

রামের এই প্রশ্নের উত্তরে দুর্কাসা মুনি রাবণকাহিনী, বৈজ্ঞান্যকাহিনী প্রভৃতি ছয়টি কাহিনী বিবৃত করেন। ব্যাস জন্মেজয়সকাশে এই ছয়টি কাহিনীই কীর্তন করেন।

শিবভক্ত রাবণ প্রত্যহ কৈলাসে বাইয়া শিবপূজা করেন, ইহাতে—

আসিতে বাইতে হুঃখ পায়ত বিস্তর।

এইরূপ অবস্থায় একদিন রাবণ শিবকে লঙ্কায় আসিয়া স্থায়ীভাবে বসবাস করিবার জন্ত পার্শ্বনা জানান। শিব বলেন, যেহেতু পার্শ্বতী রাবণের উপর সন্তুষ্ট নহেন, সেই জন্ত গৌরী হু কৈলাস নগরী, গৌরীর অজ্ঞাতসারে লঙ্কায় লইয়া যাইতে পারিলে, রাবণের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইতে পারে। রাবণ এই কথা শ্রবণ করিয়া লঙ্কায় আসিয়া, পাত্র মিত্র ও আত্মীয়বর্গকে গ্রাহ্যন করিয়া, শিবের লঙ্কায় আগমনে স্বীকৃতি-সংবাদ জ্ঞাপন করেন। ইহা অবগত হইয়া গন্ধর্বেই আনন্দিত হন। তখন রাবণের নির্দেশে বিশ্বকর্মা গৌরী সহ শিব ও তাঁহার অমৃতচর-বর্গের জন্ত উপযুক্ত বাসস্থান নির্মাণ করেন। তৎপর রাবণ বৈশাখের কৃষ্ণা চতুর্দশী তিথিতে শিব আনয়নের জন্ত কৈলাসে যাত্রা করেন। তথায় ‘অমৃতের থাকিয়া’ শিবামৃত ও বিভাধরী সহ শিব-গৌরীর নৃত্য ও শিবের ভোজন ব্যাপার দেখিয়া চমৎকৃত হন। রাবণের সঙ্গী ‘কুম্ভম্নিয়া চর’ পরামর্শ দিল, বৃদ্ধ শিবকে লঙ্কায় নিবার প্রয়াস না করিয়া—

বুড়া ছাড়ি যণে তুল বতেক স্বন্দরী।

কিন্তু রাবণ কুম্ভম্নিয়া চরের প্রস্তাবে সন্মত হন নাই। অধিক রাত্রে নৃত্যের আসর ভঙ্গ হইলে—

সর্ব্ব দেব চলি গেলা যার যেই পুরী।

শিবদুর্গা নিজা কৈলাস কৈলাস নগরী ॥

শিবদুর্গা নিজা গেলে রাবণ বহু বিবেচনার পর হিমালয়ের যে চূড়ায় কৈলাস অবস্থিত, তাহা উপভাইয়া লইবার জন্ত কুড়ি হস্ত দ্বারা আকর্ষণ করিলেন। ইহার ফলে সমগ্র কৈলাস নগরী কাপিয়া উঠিল ও কার্তিক গণেশ সহ শিবদুর্গার নিজাভঙ্গ হইল। গৌরী শিবকে এই অকস্মাৎ প্রেমের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে শিব রাবণের কামনা ও প্রার্থনার কথা গৌরীকে জ্ঞাপন করিলেন। গৌরী রাবণের এই দুঃসাহসিক প্রচেষ্টার কথা অবগত হইয়া রুষ্ট হইলেন এবং বিশ্বস্তুর মূর্তি ধারণ করিলেন, ইহার ফলে—

পর্কতের তলে হাত লাগিলেক চাপ।

উচ্চৈঃস্বরে বলে রাবণ ছাড়ি বীরদাপ ॥

রাবণের হস্তের উপর পর্কতের চাপ পড়ায় রাবণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন। তাঁহার হাত প্রায় চূর্ণ হইবার উপক্রম হইলে রাবণ একান্ত ব্যথিতচিত্তে শিবকে স্তব করিতে আরম্ভ করেন—

কাম্মএ রাবণ রাজা কি কহিষু বাণী।

যুধ দিয়া পড়ে রক্ত চক্ষে পড়ে পানি ॥

রাবণের এহেন দুর্দশা দর্শনে শিবামৃতের নন্দী ও ভৃঙ্গীর হৃদয়ে করুণা ও সহানুভূতির উদ্রেক হইল। তাঁহারা রাবণকে নিস্তার করিবার জন্ত শিবকে অমুরোধ করিতে লাগিলেন। শিব ইহাদের কথায় কৃপাবৃত্ত হইয়া পার্শ্বতীর নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহাকে বুঝাইয়া ঘরে ফিরাইয়া আনিলেন। গৌরী বিশ্বস্তুর রূপ সংযত করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলেন—

তবে ত পর্কত কৈলাস অল্পভার হইল।

মৃত্যুবৎ হইয়া রাবণ হস্ত ধসাইল ॥

ব্যথিত ও অপমানিত রাবণ শিবকে লঙ্কায় লইয়া বাইতে অপারগ হইয়া আত্মহত
করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। শিব রাবণের ঐকান্তিক আশ্রয় লক্ষ্য করিয়া, একা গোপনে লঙ্কা
বাইতে স্বীকৃত হইয়া, নিম্নোক্ত সর্ভে রথে আরোহণ করিলেন—

পথে মিয়ে রথ যদি করাচিত এড়।

তথাতে রহিব রথ কহিলাম দড় ॥

রাবণ শিব সহ রথ মাথায় তুলিয়া লঙ্কা রওয়ানা হইলেন। এ দিকে গৌরী এই সংবা
অবগত হইয়া উন্মত্তপ্রায় হইলে ভূদী তাঁহাকে এই বলিয়া আশ্বাস দেন যে—

রাবণ ভাণ্ডিয়া পথে আসিবা বিষমাণ।

গৌরীর আদেশে বরুণ রাবণের উদরে প্রবেশ করিলে তাঁহার ছরস্ব ‘লগ্নিগীড়া’ হইল
এমন সময় এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে সন্মুখে দেখিয়া রাবণ তাহাকে কিছু সময়ের অল্প রথ ধার
করিতে অনুরোধ করিলে—

ব্রাহ্মণে বলএ বৃদ্ধ গাএ নাহি বল।

মুহূর্তেক দেখি রথ থৈমু ভূমিতল ॥

রাবণ অনন্তোপায় হইয়া, মস্তক হইতে রথ নামাইয়া, ব্রাহ্মণের হস্তে সমর্পণ করিয়া—

লবি করিবান্নে যাএ ছরস্ব রাবণ।

বরুণের কৃপায় মুহূর্তেকে ‘লগ্নি’ সমাপ্ত হইল না। দশ দণ্ড কাল অতিক্রান্ত হইল।
এদিকে ব্রাহ্মণ মুহূর্তেক পরে রথ ভূমিতে নামাইয়া রাখিলেন। লগ্নি অন্তে রাবণ আসিয়া
দেখেন, রথ মাটিতে বসিয়া পড়িয়াছে। রথ উত্তোলনের অল্প অশেষ চেষ্টা করার কালে শিব
রাবণকে পূর্বসর্ভের কথা স্মরণ করাইয়া দিলে চুঃখে ও ক্ষোভে রাবণ নিজ মস্তক কাটিয়া,
স্তব করিয়া শিবকে পূজা করিতে আরম্ভ করেন—

ত্রিলোকের পুষ্পতার কধির চন্দন।

অঞ্জলি তরিয়া শিব পূজএ রাবণ ॥

একাদিক্রমে নয়টি মস্তক ছেদন করিয়া শিবকে পূজা করায় শিব সন্তুষ্ট হইয়া নিজ মস্তক
হইতে অক্ষয় জটা খুলিয়া লইলে রাবণ অকস্মাৎ সেই জটা গিলিয়া ফেলেন। শিবের বরে
রাবণের ‘নব যুগ’ পুনর্ব্বার সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল। রাবণ দশ মস্তক একত্রে ছেদন করিয়া
শিবকে উপহার দিলেন, কিন্তু—

কাটা মাথা বাঁচি উঠে জটায় কারণ।

শিব বলিলেন—অক্ষয় জটা গ্রাসের ফলে—

দেব ঋষি পঞ্চর্ষেত তোর নাহি ভয়।

শিবের প্রসাদাৎ রাবণ অক্ষয় হইলেন এবং শিবকে বনে পরিত্যাগ করিয়া লঙ্কায়
প্রত্যগমন করিলেন। এদিকে গৌরী—

মস্ত বাঘ বিগ্রহিংসা করে মানা পাণ।

হেন রাক্ষসের গুরে—

শিব চলিয়া যাওয়াতে অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছেন, এমন সময়ে শিব 'শিবরূপী এক লিঙ্গ' সেখানে রাখিয়া কৈলাসে ফিরিয়া আসিয়াছেন। শিবকে দেখিয়া গৌরীর ক্রোধ শিথিল হইল, তিনি শিবের ছুচরিত্রের কথা বর্ণনা করিয়া ছুঃখ করিতে লাগিলেন। শিবও কটুক্তি শুনিয়া রাগিয়া বলিলেন—

আমারে তর্জ্জ কেনে চক্ষু করি রাঙ্গা।

ভাল স্থান চাইয়া গৌরী ভূমি বৈস সাঙ্গা ॥

শিবের এই উক্তি শুনিয়া গৌরীর ক্রোধ বৃদ্ধি পাইল। তিনি শিবকে নিরাভরণ করিয়া পুরীর বাহিব করিয়া দিতে পুত্রদ্বয়কে আদেশ করিলেন। এক্ষণ অবস্থায় নারদ আসিয়া উপস্থিত হইলে গৌরী ভাগিনেয়ের নিকট তাঁহার মাতুলের কীর্ত্তির কথা সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া বলিলেন—শিব, রাক্ষস রাবণের পুরীতে গিয়াছিলেন, এখন আর তাহাকে ঘরে নেওয়া চলে না, ঘরে নিলে কোন দেবভাই আর গৌরীর হাতে খাইবেন না—

ঘরেতে উঠিলে হৈব পাকেতে বর্জ্জন।

নারদ, গৌরীসকাশে শিব যে কিরূপে রাবণকে 'ভাগিয়া' চলিয়া আসিয়াছেন, তাহা সবিস্তারে বর্ণনা করিলে গৌরীর ক্রোধ শান্ত হইল এবং শিবকে পূজা করিয়া গৃহে লইয়া গেলেন। ত্রিদশের রাজা শিব রাক্ষসের পুরীতে গেলে দেবসমাজে বড় লজ্জার বিষয় হয়, সেই জন্তই—

এ কারণে কহিলাম এত মন্দ বাণী।

বলিয়া গৌরী শিবের নিকট মার্জ্জনা ভিক্ষা করিলেন।

[২] বৈজ্ঞানিকমঙ্গল

ভোজরাজ্যের দেশে 'মন্ত্রবীৰ্য্য' নামে এক শুণী ছিল, তাহার পুত্র 'অগ্নিবীৰ্য্য'ও পিতার তুল্য পণ্ডিত। মন্ত্রবীৰ্য্যের মন্ত্রের গুণে এক পক্ষ বা বিংশতি দিবসের মৃতদেহেও প্রাণসঞ্চার হয়। উক্ত দেশের অনৈক ব্রাহ্মণপুত্রের সর্পাঘাতে মৃত্যু হইলে তাহাকে দাহ না করিয়া, শুধু মুখাঘি করিয়া, 'খুলের ভেরুয়া'র উপর স্থাপন করিয়া নদীতে ভাসাইয়া দেওয়া হয়। মন্ত্রবীৰ্য্য শুণীর পুত্রবধু উক্ত মৃতদেহ দেখিয়া, তাহাকে মন্ত্রের দ্বারা সঞ্জীবিত করিয়া, খন্তর-শান্তীকে সকল ঘটনা বিবৃত করেন। ব্রাহ্মণতনয় কিছু দিন মন্ত্রবীৰ্য্যের গৃহে অবস্থান করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করেন। উক্ত দেশের রাজার জ্বর 'রক্তবাত' হইলে বৈজ্ঞানিকমন্ত্র অগ্নিবীৰ্য্য শাস্ত্র বিচার করিয়া দেখেন, 'ভৃঙ্গকেশী' ঔষধ ব্যবহারে এই রোগ আরোগ্য হয়। তখন তিনি উক্ত ঔষধের উপকরণ সংগ্রহের জন্ত রওয়ানা হন। সারা দিন পর্বতে পর্বতে ঔষধ অন্বেষণ করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া রাত্রে নিদ্রিত হন। বৈজ্ঞানিকমন্ত্রের রূপায় ঔষধ কোথায় পাওয়া যাইবে, তাহা স্বপ্নে দেখিয়া জাগিয়া উঠেন এবং তাহার নিকটেই ঔষধ দেখিতে পান। স্বপ্নে দৃষ্ট লিঙ্গ ও উক্ত পল্লবের চতুঃপার্শ্বে—

মাংসে বঞ্চিত মুণ্ড দেখে শত শত ।

তিনি ঐ লিঙ্গ পূজা করিয়া ঔষধ সহ গৃহে ফিরিয়া আসেন এবং উক্ত ঔষধের দ্বারা রোগীকে রোগমুক্ত করেন এবং গৃহে আসিয়া সকল কথা পিতাকে নিবেদন করেন । বৃদ্ধ বৈজ্ঞান্যের 'রাবণকাহিনী' জানা ছিল, তিনি পুত্র সহ—

সেই মুণ্ড সেই লিঙ্গ সেই তপোবন ।

দেখিয়া চিনিতে পানেন এবং প্রত্যহ আসিয়া ভক্তিতাবে বৈজ্ঞান্যের পূজা করিতে থাকেন ।

[৩] মুনিব্রহ্মকাহিনী

সত্য যুগে মুনিব্রহ্ম নামে জনৈক নৃপতি ছিলেন । ইনি বহু তপস্তার ফলে শম্ভভেদী শর প্রাপ্ত হন । এক দিবস যুগ্মা করিতে গিয়া ঐ শম্ভভেদী শর দ্বারা বেদপাঠরত জনৈক ব্রাহ্মণকে যুগ্মজানে হত্যা করেন । এই পাপে তাঁহার সর্বাঙ্গে রক্তবাত হয় । বশিষ্ঠের নির্দেশে নৃপতি কোপীন পরিয়া বাত্মকির তপোবনে গিয়া গঙ্গাস্নানান্তর গঙ্গাজলে শিবকে স্নান করাইয়া ষথারীতি পূজা ও স্তব করেন এবং শিবপদে সেই রাতে শুইয়া রহেন । রাতে বৈজ্ঞান্য স্বপ্নে ঔষধের ব্যবস্থা বলিয়া দেন । স্বপ্নপ্রাপ্ত ব্যবস্থা অনুসরণ করিয়া ব্রাহ্মা ব্যাধি-মুক্ত হন । রাজসঙ্গে তাঁহার রাজ্যের আরও বহু রোগী রোগমুক্ত হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন ।

[৪] রাজপুত্রকাহিনী

স্বর্ঘ্যরাজের যুবক পুত্র ভৃগুমুনির পত্নী জনম্ভার সতীত্ব নাশ করিলে, সেই পাপে তাহার পিণ্ডশূল, শূল বাত ও রক্তমহাবাত রোগ হয় । বৈজ্ঞান্যের মহিমা অবগত হইয়া সে রোগ-মুক্তি কামনায় তাঁহার পূজা করিয়া সাত দিন উপবাসী হইয়া পড়িয়া রহিল । কিন্তু বৈজ্ঞান্যের দয়া হইল না । বৈজ্ঞান্যের আদেশে পূজারী ব্রাহ্মণেরা তাহাকে তাড়াইয়া দিল । কারণ—

ইহারে দেখিলে হএ ব্রহ্মবধের পাপ ।

ইহার শরীরে আছে ব্রাহ্মণের শাপ ॥

[৫] সন্দককাহিনী

বশিষ্ঠ গোত্রে সন্দক নামক জনৈক ব্রাহ্মণ অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন । তাঁহার পত্নীর পরামর্শে তিনি বৈজ্ঞান্যের ষথাবিধ পূজা করিয়া—

দায়িত্ব না থকায় যদি প্রভু বিশ্বনাথ ।

অপমৃত্যু হইয়া মরিমু তোমার সাক্ষাৎ ॥

বলিয়া শুইয়া থাকেন । অবশেষে বৈজ্ঞান্যের কৃপায় অদরাজ্যের অধিপতি হন ।

[৬] অঙ্গ ব্রাহ্মণীর কাহিনী

ঘাপর বৃগে নারায়ণীনারী জনৈক ব্রাহ্মণী এক দিবস অজ্ঞাতে কেশবৃক্ষ বিষ্ণুপত্নের
বারা শিবপূজা করায় ষাটশ বৎসরের জ্ঞাত অঙ্গ হইয়া পড়েন। সেই সময়ে বিশ্বামিত্রের
নির্দেশে তাঁহার সঙ্গে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী সহ বায়ীকির তপোবনে উপস্থিত হন এবং বৈষ্ণবধর্মকে
প্রণাম, স্তুতি ও প্রদক্ষিণ করিয়া তাঁহার সম্মুখে শয়ন করেন, রাত্রে বৈষ্ণবধর্ম স্বপ্নে কি করিলে
আবার চক্ষুস্থান হইতে পারেন, তাহা ব্রাহ্মণীকে বলিয়া দেন।

বাংলা প্রায় মঙ্গলকাব্যের মূলমন্ত্রসম্বন্ধে কোন না কোন পৌরাণিক কাহিনীর
সঙ্গে তাহাদের যোগসূত্র আবিষ্কৃত হয়। মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল প্রভৃতি বিভিন্ন
মঙ্গলকাব্যের কোন কোন কাহিনীর সঙ্গে পৌরাণিক কাহিনীর সাদৃশ্য রহিয়াছে। আলোচ্য
বৈষ্ণবধর্মমঙ্গলে যে ছয়টি কাহিনী পাইতেছি, তন্মধ্যে প্রথম কাহিনীর সঙ্গে শিবপুরাণস্তম্ভত
জ্ঞানসংহিতার কোন কোন কাহিনীর আশ্চর্য মিল আছে। সম্ভবতঃ কবি জ্ঞানসংহিতোক্ত
কাহিনীকে কেন্দ্র করিয়াই তাঁহার রাবণকাহিনী রচনা করিয়া থাকিবেন। জ্ঞানসংহিতায়
'বৈষ্ণবধর্মোৎপত্তিবর্ণন' নামক ৫৫ অধ্যায় ও পরবর্তী ৫৬ অধ্যায়ে নিম্নোক্ত কাহিনীটি আছে:—

একদা ঐশ্বর্যগর্ভিত রাক্ষসরাজ রাবণ শিবকে প্রসন্ন করিবার জন্ত হিমালয়ে গিয়া ভূতলে
গর্ত খনন করিয়া তথায় অগ্নিস্থাপনপূর্বক ভস্মিকটে শিবস্বাপন করিয়া বিবিধ হোম করিতে
থাকেন। তথাপি শিব প্রসন্ন হইলেন না দেখিয়া নিজ মন্তক ছেদনপূর্বক মহাদেবের পূজা
আরম্ভ করেন। ক্রমে নয়টি মন্তক ছিন্ন হইল, একটি মাত্র অবশিষ্ট আছে, এমন সময়ে
শঙ্কর প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে অতীষ্ট বর প্রদান করেন। শিবের বরে রাবণ অতুল বলশালী
হন এবং তাঁহার মন্তক পূর্ববৎ স্তম্ভ হয়। এই শিবই বৈষ্ণবধর্ম নামে লোকে প্রসিদ্ধ আছেন।

তদা শিরাংসি ছিদ্ৰা স গৃহনং শঙ্করস্ত চ ।

আরম্ভত তদা তেন ছিন্নানি নব বৈ যদা ॥৪

একস্মিনবশিষ্টে তু প্রসন্নঃ শঙ্করস্তদা ॥৫

* * *

যথেন্নিতং বদৌ তস্মৈ হতুলং বলমুত্তমম্ ॥৮

শিরাংসি পূর্ববৎ কৃদ্বা নীরজানি তথা পুনঃ ।

* * *

বৈষ্ণবধর্মো লোকে প্রসিদ্ধো হিতকারকঃ ।

প্রণিপত্যাগতচ্চাং বিজ্ঞেভুং ভুবনভ্রমম্ ॥১৬

(শিবপুরাণ, জ্ঞানসংহিতা, ৫৫ অধ্যায়)

শিববরপ্রাপ্ত রাবণের নিকট হইতে সমুদ্র কাহিনী অবগত হইয়া নারদ রাবণকে এই বৃত্তি
দিলেন যে, রাবণ যেন কৈলাস পর্বত উত্তোলনে যত্নবান হন। কৈলাস উত্তোলন করিতে
পারিলেই তাহার সকল কামনা সিদ্ধ হইবে।

কৈলাসোদ্ধরণে যত্নঃ কর্তব্যশ্চ যদা পুনঃ ॥৪

যদি চৈব ধ্বতশ্চায়মুচ্চৈব ভবিষ্যতি ।

তদা বৈ সকলং সর্বং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥৫

পূর্ববৎ স্থাপয়িত্বা তৎ পুনরাগচ্ছ বৈ শ্রবম্ ।

নারদের বৃত্তি অল্পসারে রাবণ কৈলাস উন্মোচন করিলে তথাকার সকল বস্তুই বিপর্যস্ত হইয়া পড়ে। শিব এই ঘটনা জানিতে পারিয়া বলদর্পিত রাবণকে অভিশাপ প্রদান করিয়া বলেন যে, তোর গর্বধ্বংসকারী পুরুষ ক্ষীভ্রই উৎপন্ন হইবে।

শঙ্খাচ্ছিবেন শঙ্খাচ্ছ রাবণো বলদর্পিতঃ ।

ক্ষীভ্রঃ তব হস্তাশ্রয়ঃ দর্পহন্ত ভবিষ্যতি ॥১০

(শিবপুরাণ, জ্ঞানসংহিতা, ৫৬ অধ্যায়)

উপরে উদ্ধৃত জ্ঞানসংহিতার কাহিনী লক্ষ্য করিলে অল্পমান হয় যে, এই দুই অধ্যায়ের কাহিনীকে পরিবর্তন পরিবর্দ্ধন করিয়া বৈষ্ণনাথমঙ্গলের কবি রাবণ-কাহিনী রচনা করিয়াছেন।

বৈষ্ণনাথমঙ্গলের ষষ্ঠ কাহিনীতে আছে, কেশধৃত্ত বিষ্ণুপত্নের দ্বারা শিবপূজা করায় ব্রাহ্মণী অন্ধ হইয়া পড়েন। চণ্ডীমঙ্গলে কালকেতুর গল্পে আছে—কীটধৃত্ত গুপ্তের দ্বারা শিব-পূজা করায় শিব রুষ্ট হইয়া ইন্দ্রপুত্র নীলাধরকে অভিশাপ দিয়াছিলেন। উক্ত কাহিনীতে আছে, বিষ্ণামিত্তের সঙ্গে অন্ধ ব্রাহ্মণী সহ ব্রাহ্মণ বাম্বীকির তপোবনে উপনীত হইয়া বৈষ্ণনাথকে প্রণাম ও স্তুতি করিয়াছিলেন। আধুনিক বৈষ্ণনাথধামের প্রায় ৬ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে একটি গুপ্তশৈলোপরি একটি বন বাম্বীকির তপোবন নামে প্রসিদ্ধ। এই বনে এক গুহা আছে, তন্মধ্যে শিবলিঙ্গ স্থাপিত। প্রবাদ, মহাকবি বাম্বীকি ঐ গুহায় বাস করিতেন।

বৈষ্ণনাথমঙ্গলের রাবণ-কাহিনীতে হয়-গৌরীর কলহের এক চিত্র আছে। অল্পরূপ চিত্র মনসামঙ্গলেও পাইতেছি। ক্রুদ্ধা গৌরী পুত্র লম্বোদরকে সঙ্ঘোষন করিয়া বলিতেছেন—

মহামায়া বোলে পুত্র স্তন লম্বোদর ।

হস্তে ধরি পুরী হনে বুড়া বায় কর ॥

কর্ণ হনে কাড়ি লও কুণ্ডল ভূষণ ।

প্রথমে খসিও বুড়ার ঘোণীর লক্ষণ ॥

* * *

বুঝ নিয়া বেচ পুত্র দেশ দেশান্তর ।

বলহ নিয়া রাখ সিংহের মন্দির ॥

ভাদের বুলি কর অগ্নির আহ্বার । ইত্যাদি

শ্রীহট্ট জেলার গয়গড়নিবাসী ষষ্ঠীর দত্তের পদ্মাপুরাণে অল্পরূপ কয়েকটি পংক্তি আছে—

মহামায়া বলে স্তন পুত্র লম্বোদর ।

হস্তে ধরি বুড়ারে দেশের বায় কর ॥

হাত হনে কাড়ি লও কুণ্ডল জিন্দুল ।

প্রথমে কাড়িলা লও বুড়ার কুল ॥

* * *

বুঝ নিয়া বেচ পুত্র দেশদেশান্তর ।

মহে বাসি রাখ নিয়া ব্যাঘ্রের মন্দির ॥

ভাদের বুলি নিয়া কর অগ্নির আহ্বার । ইত্যাদি

উভয় কবিই প্রায় সমসাময়িক। কে কাহার নিকট গুণী, বলা যায় না। বহুপ্রচলিত কোন ছড়া উভয় কবিই হয় ত অবলম্বন করিয়া থাকিতে পারেন।

তাৎপর্যচাৰ্য

শ্ৰীঅনন্তলাল ঠাকুৰ

কয়েকখানি জায়বৈশেষিক গ্ৰন্থে তাৎপর্যচাৰ্যৰ উল্লেখ পাওৱা যায়। আত্মতত্ত্ববিবেকে উদয়নাচাৰ্য, জায়লীলাবতীতে বল্লভাচাৰ্য, খণ্ডনোদ্ধারে বিত্তীয় বাচস্পতি এবং কণাদৰহস্তে শঙ্কৰ মিশ্ৰ তাঁহাৰ গ্ৰন্থ হইতে পংক্তি উদ্ধাৰ অথবা আলোচনা কৰিয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় ৮বিদ্যেশ্বৰীপ্ৰসাদ বিবেকী এবং মহামহোপাধ্যায় ৮চন্দ্ৰকান্ত তৰ্কালঙ্কাৰ তাৎপর্যচাৰ্যকাকার বাচস্পতি মিশ্ৰ এবং তাৎপর্যচাৰ্য অভিন্ন ব্যক্তি, একুপ মত প্ৰকাশ কৰিয়াছেন। কাশী সৱনভীষন হইতে প্ৰকাশিত গবেষণা-প্ৰবন্ধাবলীৰ^১ তৃতীয় খণ্ডে পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় শ্ৰীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় স্বীয় জায়বৈশেষিক শাস্ত্ৰেৰ ইতিহাস ও গ্ৰন্থবিবৰণে তাৎপর্যচাৰ্যকে স্বতন্ত্ৰ ব্যক্তিক্ৰমে দেখিয়াছেন। তাৎপর্যচাৰ্যৰ কয়েকটি সিদ্ধান্ত প্ৰচলিত জায়বৈশেষিক মতৰ সহিত সামঞ্জস্যহীন। এই জন্তই কবিরাজ মহাশয় উক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন বলিয়া মনে হয়। তাঁহাৰ মতে তাৎপর্যচাৰ্য কাশ্মীৰেৰ অধিবাসী হওয়া সম্ভবপর।

বিগত কয়েক বৎসৰে জায়বৈশেষিক দৰ্শনৰ বহু গ্ৰন্থ প্ৰকাশিত হইয়াছে। বাচস্পতি মিশ্ৰেৰ তাৎপর্যচাৰ্যক সহিত পূৰ্বোক্ত গ্ৰন্থগুলিৰ সংশ্লিষ্ট অংশ নবপ্ৰকাশিত ব্যাখ্যাগ্ৰন্থ-সমূহেৰ সাহায্যে আলোচনা কৰিলে তাৎপর্যচাৰ্যকাকার এবং তাৎপর্যচাৰ্য অভিন্ন ব্যক্তি, এই সিদ্ধান্তই সঙ্গত বলিয়া মনে হইবে।

আমরা এ স্থলে কবিরাজ মহাশয়েৰ উদ্ধৃত পংক্তিগুলি ক্ৰমশঃ আলোচনা কৰিয়া দেখিতে চাই।

আত্মতত্ত্ববিবেকে উদয়নাচাৰ্য অনুমানের স্বতঃপ্ৰামাণ্য সম্পর্কে তাৎপর্যচাৰ্যৰ মত উল্লেখ কৰিয়াছেন,—

এককোটিনিয়তো বহুতবো নিশ্চয়ঃ। জ্ঞানতদ্বদ্ব্যবহিপি চ জ্ঞানে ন দৈতমিতি ব্যবহিতিয়েব। প্ৰামাণ্যনিশ্চয়স্ত তত্ৰাপি পন্নত এবোতি জায়সম্ভাৱঃ। ইত এব বিশেষাত্মদৃশস্ত স্বত এবোতি তাৎপর্যচাৰ্যঃ।—আ. ত. বি. সোদাইটি সংস্করণ, পৃ. ৬৯৭-৮।

শঙ্কৰ মিশ্ৰ উক্ত সন্দৰ্ভেৰ নিয়োক্তরূপ ব্যাখ্যা কৰিয়াছেন,—

নষেবমভ্যবাসায়প্ৰামাণ্যে স্বতন্ত্ৰং সমান্নাত্মিত্যপসিদ্ধান্ত ইত্যত আৰ প্ৰামাণ্যেতি। যদি ব্যসনিতয়া তজ্জ প্ৰামাণ্যমহমীয়তে তদা তৎপ্ৰামাণ্যমহমানাদেব গৃহ্যতে—জায়ময়ে প্ৰামাণ্যন্ত নিত্যাহমেয়দ্যদিত্যৰ্থঃ। নবহমানন্ত নিরন্তসমন্তবিজ্ঞানকন্ত স্বত এব প্ৰামাণ্যমিতি কথং দীকা, কথং বা তবাপি তজ্জ তাদৃশমেব ব্যাখ্যানমত আৰ। ইত এবোতি। তজ্জাপি

স্বতঃ প্রামাণ্যমপ্রামাণ্যশঙ্কানাম্পদস্যং সীকাঙ্কতাংপর্যবিসয়ো মমাপি তদ্বিপ্রায়কমেব ততঃ
তথা ব্যাখ্যানমিত্যর্থঃ ।—আত্মতত্ত্ববিবেককল্পলতা, সোসাইটি-সং, পৃ. ৬২৮-৯ ।

এ স্থলে শব্দর মিশ্রের মতে

‘অমুমানস্ত নিরন্তসমস্তবিশ্রমাশঙ্কত স্বতঃ এষ প্রামাণ্যম্’

বাক্যটি কোন টীকাগ্রহ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, উক্ত
টীকাসম্বন্ধ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া আত্মতত্ত্ববিবেককার স্বয়ং অমুমানের স্বতঃ প্রামাণ্য স্বীকার
করিয়াছেন। রঘুনাথ শিরোমণি এবং ভগীরথ ঠাকুরও উক্ত বাক্যটিকে কোন টীকাগ্রহের
অন্তর্গত বলিয়া ধরিয়াছেন। এ স্থলে মনে রাখিতে হইবে যে, প্রচলিত জ্ঞানসম্প্রদায়
অমুগারে অমুমান পরতঃ প্রমাণ।

বাচস্পতি মিশ্রের জ্ঞানবাত্তিকতাংপর্যটীকার নিম্নোক্ত সম্বন্ধে আমরা শব্দর মিশ্রের
উল্লিখিত বাক্যটি প্রায় অবিকল উদ্ধৃত দেখিতে পাই,—

অমুমানস্ত তু প্রযুক্তিসামর্থ্যলিঙ্গমমোহততঃ বা নিরন্তসমস্তব্যভিচারশঙ্কস্ত স্বতঃ

এব প্রামাণ্যমমুহমেন্যাব্যভিচারিলিঙ্গমুৎপাদ্যং ।—তা. গী. কলিকাতা-সং, পৃ. ৯ ।

এবং উহার ব্যাখ্যাগ্রহ জ্ঞানবাত্তিকতাংপর্যপরিসুত্বিতে উদয়ন স্পষ্টভাবেই অমুমানের স্বতঃ
প্রামাণ্য সম্পর্কে বাচস্পতি মিশ্রের মতের অমুর্ভবন করিয়াছেন। তিনি বলেন,—

বিধা হি ব্যভিচারশঙ্কা। কারণতঃ স্বরূপতচ্চ। সা চ ব্যাপ্তিপক্ষবর্মতাগ্রাহকৈরেব
প্রমাণৈরপনীয়ত ইতি ভবতি নিরন্তসমস্তব্যভিচারশঙ্কমহিমিতিজ্ঞানম্। তত্বেবস্তুতত স্বতঃ এব
প্রামাণ্যং নিশ্চীয়ত ইতি শেষঃ ।—তা. বা. তা. প. পৃ. ১১২ ।

তাংপর্যটীকার অন্তর্ভুক্ত অমুমানের স্বতঃ প্রামাণ্যের কথা প্রসঙ্গক্রমে উল্লিখিত হইয়াছে
এবং সেখানে উদয়ন অমুরূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন^২ ।

এ স্থলে দেখা গেল যে, আত্মতত্ত্ববিবেকে বাহা তাংপর্যচাৰ্ণের মত বলিয়া উল্লিখিত, শব্দর
ও অজ্ঞাত ব্যাখ্যাকর্তারা বাহা কোন টীকার অন্তর্গত এবং উদয়নের অমুমোদিত বলিয়া
গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা বাচস্পতি মিশ্রের তাংপর্যটীকার বর্তমান এবং তাংপর্যপরিসুত্বিতে
উদয়নাচার্য তাহার ব্যাখ্যা এবং অমুমোদন করিয়াছেন।

খননশঙখাত্ত প্রেছে শ্রীহর্ষ সামান্তলক্ষণা প্রত্যাসত্তি সম্পর্কে তাংপর্যটীকার বাচস্পতি
মিশ্রের মত উল্লেখপূর্বক বলিয়াছেন,—

ইন্দিয়ৈণ সামান্তলক্ষণয়া প্রত্যাসত্ত্যা ব্যাপ্তিগ্রহণকালে সর্বাঙ্কজাতীয়ব্যক্তয়ো গৃহ্যন্তে ।

যদনভ্যুপগমে স্বতকমুদাহ বদ্যারাঃ পুত্রপ্রাধনমিবেতি বাচস্পতিরূপালঙ্ঘ্যবাদীঃ ।—বঙন,
কাশী-সং, পৃ. ৩৫৪ ।

২। অমুমানস্ত স্বতঃ প্রামাণ্যতয়া.....তা. গী., পৃ. ৪ ।

অমুমানস্ত ইতুপলক্ষণম্। স্বত ইতি চ। তদিতরতাপি স্বতঃ পরতন্ত প্রামাণ্যসিদ্ধেঃ...। পরিসুত্বি, পৃ. ৬১।
এ স্থলে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, বদমান উপাধায় পরিসুত্বিপ্রকাশে উক্ত সম্বন্ধের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন,—স্বত ইতি
পরমতান্তিপ্রায়ম্। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, বাচস্পতির মতটি নব্যনৈরামিক সম্প্রদায়ে প্রচলিত হয় নাই।

খণ্ডনোদ্ধার গ্রন্থে দ্বিতীয় বাচস্পতি স্মারমতে খণ্ডনখণ্ডখণ্ডের সমালোচনা করিয়াছেন। উক্ত সন্দর্ভের সন্নিধানে তিনি সামান্যলক্ষণা প্রত্যাশক্তি স্বীকারের পক্ষে তাৎপর্য-টীকাকারের যুক্তির পুনরুল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন,—

সামান্যলক্ষণায়াং সিদ্ধায়াং সর্বধুমব্যক্তিবু ব্যাপ্তিগ্রহঃ সম্ভবতি । প্রত্যাশক্তিসৌকর্যাদিত

তথৈবোক্তং তাৎপর্যচর্চাঃ ।—খণ্ডনোদ্ধার, পৃ. ৮১ ।

সামান্যলক্ষণা প্রত্যাশক্তি গদ্যে উপাখ্যায়ের তৎপরিভাষা গ্রন্থে প্রথম আবিস্কৃত, এই মতটি বিচারসহ নহে।* উহা বাচস্পতি মিশ্রের তাৎপর্যটীকা এবং স্মারকণিকার উক্ত সর্বোপসংহারক ব্যাপ্তির সঙ্গে কার্যত অভিন্ন। এই প্রসঙ্গে শ্রীহর্ষের পূর্বোক্ত সন্দর্ভটির সহিত তাৎপর্যটীকার অন্যান্য সন্দর্ভ তুলনীয়,—

তদন্তঃ স্বত্বকরুদ্বাং বস্তুভ্যঃ পূজ্যার্থমমিব । তদ্ব্যবহারবিধি সর্বোপসংহারেণাবিনা-

ভাবোৎপত্তব্যঃ ।—তা. দী. পৃ. ৪০ ।

এখানে দেখিতেছি, খণ্ডনোদ্ধারে উল্লিখিত তাৎপর্যচর্চা এবং তাৎপর্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র একই কথা বলিতেছেন।

স্মারলীলাবতী গ্রন্থে বল্লাভাচার্য বিদ্বৎপ্রভৃতিকে একত্রে স্মার স্বতন্ত্র সংখ্যা বলিয়া স্বীকার করিতে গিয়া বিরুদ্ধবাদী স্মারভূষণকার ভাসর্বজ্ঞের মতের উপর কটাক্ষ করিয়া বলিয়াছেন,—

তদ্বদং চিরন্তনবৈশেষিকমতদ্বয়ং ভূষণকারভাতিজ্ঞপাকরম্ । তদ্বদমমান্নাততা

ভাসর্বজ্ঞত্ববিদ্যমানার্থমপ্যবমততে । তথাচ তদভ্যাসিনস্তাৎপর্যচর্চাৎ সিংহদামঃ সংবিদেধ

হি ভগবতীত্যাহি ।—স্মারলীলাবতী, কাশী-সং, পৃ. ৩৫৮ ।

বৈশেষিকমতে বিদ্বৎপ্রভৃতি একত্রে মত এক একটি স্বতন্ত্র সংখ্যা। উহার ভূষণকার-স্বীকৃত ‘একত্বসমুচ্চয়’ অথবা ‘অপেক্ষাবুদ্ধিবৈচিত্র্য’ মাত্র নহে। ভূষণকার এই বিষয়ে প্রাচীন বৈশেষিকমতে যে দোষারোপ করিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত লজ্জার বিষয়। এ বিষয়ে আচার্যকেও অবমাননা করিয়া ভাসর্বজ্ঞ নিজের মূর্ত্তাহই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। আচার্য-মতাহারী তাৎপর্যচর্চা সদৃশে ঘোষণা করিয়াছেন,—‘ভগবতী বুদ্ধিই আমাদের স্বতন্ত্রবস্ত্ত স্বীকারের কারণ’।

বর্তমান সন্দর্ভে ‘আচার্য’ শব্দ দ্বারা কাহার প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে, তাহা বুঝা প্রয়োজন। স্মার-বৈশেষিক দর্শনগ্রন্থে ‘আচার্য’ শব্দে পরবর্তী কালে উদয়নকে বুঝাইলেও পূর্বে কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির আচার্য নামে অভিহিত হইতেন, এমন নহে। আমাদের মনে হয়, বর্তমান স্থলে আচার্য শব্দ দ্বারা স্মারবার্তিককার উদ্যোতকর অভিপ্রোভ। বস্তুতঃ তিনি বিশেষ সন্নিধানে পূর্বক স্মারবার্তিকে দ্বিধাদির স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন,—

যতো ব্যবহা তে দ্বিধাদয়ঃ ।—ভা. বা. কলিকাতা-সং, পৃ. ৫০৬ ।

যঃ পুন্ময়েকত্বং দ্বিধাবীংস্ক ন প্রতিপত্ততে তত্ত্ব ম সন্মুচ্চয়ঃ ন সন্মুচ্চয়নিয়তিঃ ।—ঐ, পৃ. ৫০৭ ।

এই প্রসঙ্গে টীকাকার বাচস্পতি বলেন,—

সংবিদেব ভগবতী বস্তুপদমে নঃ শরণম্ । সমুচ্চয়াহিবিলক্ষণং দ্বিহাস্তবগাহমানী
ব্যবস্থাপিকা দ্বিহাদীনাম্ । তদ্বস্তুসরণপ্রকারম্ যুক্তিবহনতরা বার্তিককৃত্য কৃত ইতি
মন্তব্যম্ ।—তা. টী. পৃ. ৫০৬ ।

এ স্থলে দ্রষ্টব্য এই যে, বলভাচার্যের গৃহীত তাৎপর্যচাৰ্যের উক্তি ‘সংবিদেব ভগবতী’ ইত্যাদি তাৎপর্যচীকার অন্তর্গত । আচার্য উদ্যোতকের দ্বিহাদিসম্পর্কিত প্রসিদ্ধ মতের সম্বন্ধনকল্পে বাচস্পতি মিশ্র উহার উল্লেখ করিয়াছেন । অতএব পরবর্তী বাক্যে উল্লিখিত ‘বার্তিককার’ উদ্যোতকরই যে ‘আচার্য’ পদের দ্বারা বলভের অভিপ্রেত, তাহাও সহজেই বুঝা যায় ।

কণাদরহস্য গ্রন্থে শঙ্কর মিশ্র তাৎপর্যচাৰ্যের অপর একটি পংক্তি উদ্ধার করিয়াছেন,—

উদ্ধৃতরূপবস্তুবুদ্ধতম্পর্শবস্তু চ মিলিতং তদ্ব্যমিতং তাৎপর্যচাৰ্যঃ ।—কণাদরহস্য,
কাশী-সং, পৃ. ২৪ ।

ইহার অভিপ্রায় এই যে, তাৎপর্যচাৰ্যের মতে দ্রব্যপ্রত্যয়ের প্রতি উদ্ধৃতরূপ এবং উদ্ধৃতম্পর্শ উভয়ই কারণ । বিষয়টি গবেষণ উপাধ্যায়ের তত্ত্বচিন্তামণি গ্রন্থেও আলোচিত হইয়াছে । সেখানে উহা কোন টীকার মত* এরূপ ইঙ্গিত আছে । কিন্তু বর্তমান তাৎপর্য-চীকার উক্ত সনকটি পাওয়া বাইতেছে না । উহার প্রতিপাত সিদ্ধান্ত দ্বায়দর্শনের তৃতীয় অধ্যায় প্রথম অঙ্কিকের ৩৮ এবং ৪০ স্থলের বিষয়ীভূত । কিন্তু স্থল দুইটির তাৎপর্যচীকা বর্তমান নাই । আমরা পূর্বে দেখিয়াছি, শঙ্কর মিশ্র চীকা বলিতে তাৎপর্যচীকাকেই লক্ষ্য করিয়াছেন । অতএব এ স্থলেও তাৎপর্যচাৰ্য শব্দের দ্বারা বাচস্পতি মিশ্র অভিপ্রেত, ইহাই সম্ভবপর ।

শঙ্কর মিশ্র, দ্বিতীয় বাচস্পতি এবং বলভাচার্য তাৎপর্যচাৰ্যের যে কয়টি সিদ্ধান্তের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার কোনটি আক্ষরিকভাবে তাৎপর্যচীকায় বর্তমান, কোনটি বা পরম্পরাক্রমে তাৎপর্যচীকা-সংশ্লিষ্ট । অতএব বাচস্পতি মিশ্র ও তাৎপর্যচাৰ্য অভিন্ন এবং দ্বায়বার্তিকের প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাগ্রন্থ তাৎপর্যচীকার নামানুসারে বাচস্পতিকে তাৎপর্যচাৰ্য বলা হইত, ইহাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয় ।

রেবন্ত

শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস

সূর্যদেবতার অদ্বিতীয় পুত্ররূপে রেবন্ত ভারতীয় পৌরাণিক ঐতিহ্যে সুপরিচিত। উত্তর-ভারতের বিভিন্ন স্থানে এই দেবতার মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। এর জন্মকাহিনী ও পূজাপদ্ধতি সম্পর্কে নানা পুরাণে কিছু কিছু বিবরণও পাওয়া যায়। অবশ্য এ কথা স্বীকার্য যে, সূর্য্যপূজার মত রেবন্তপূজার প্রচলন এত অধিক ছিল না এবং তাঁর পিতার তুলনায় রেবন্তের বিষয়ে আলোচনা করবার উপযোগী উপকরণ আমরা পেয়েছি অনেক কম। কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে রেবন্তের গুরুত্ব অধিক না হলেও সূর্য্যপূজা ও সৌর ধর্মের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠ। তা ছাড়া দুর্গা লক্ষ্মী প্রভৃতি ব্যাপকভাবে উপাসিতা দেবীগণের পূজার সঙ্গে রেবন্তপূজার কিছু কিছু যোগাযোগ খুঁজে পাওয়া যায়। হুতরাং প্রাচীন ভারতের ধর্মবিবর্তনের ইতিহাসে রেবন্তের স্থান উপেক্ষণীয় নয়।

সম্প্রতি কয়েক জন শ্রদ্ধেয় সুপণ্ডিত লেখক রেবন্ত ও তাঁর পূজা সম্পর্কে কিছু মূল্যবান আলোচনা করেছেন। বর্তমান প্রবন্ধের প্রারম্ভে তাঁদের সিদ্ধান্তগুলি উদ্ধৃত করা যেতে পারে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত বাঙলার ইতিহাসের প্রথম খণ্ডে প্রাচীন বাঙলার ধর্মমত সম্পর্কে ডাঃ শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচি মহাশয়ের একটি আলোচনা স্থান পেয়েছে। সেই প্রসঙ্গে রেবন্ত সম্পর্কে তিনি বলেন^১ : “We possess a number of images of Revanta who is described in some of the Puranas as the son of the Sun-god, begotten on Surenu,.....he does not seem to have had any popularity in the orthodox Brahmanical circle and belonged to the folk-religion, his cult being an adjunct of Sun-worship.” ডাঃ শ্রীনীহাররঞ্জন রায় তাঁর কিছু কাল পূর্বে প্রকাশিত ‘বাঙালীর ইতিহাস’ গ্রন্থে রেবন্ত সম্পর্কে যে মত প্রকাশ করেছেন, তা এই^২ : “পুরাণকাহিনী অনুসারে অশ্বারূঢ় এবং পরিজনসহ যুগয়াবিহারী রেবন্তদেবতার সঙ্গে সূর্য্যের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। এই রেবন্তদেবতার কয়েকটি মূর্তি বাংলার নানা স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে।...মনে হয়, রেবন্ত আদিতে পশুজীবী শিকারী কোমের লোকায়ত দেবতা ছিলেন এবং লোকায়ত জীবনের সঙ্গেই ছিল তাঁহার সম্বন্ধ। কিন্তু পরবর্তী কালে কোনও সময়ে তিনি ব্রাহ্মণ্য ধর্মে স্বীকৃতি লাভ করেন এবং অশ্বারূঢ় বলিয়া সূর্য্যের সঙ্গে আত্মীয়তাবদ্ধ হন।” সম্প্রতি বাঙলা মঙ্গলকাব্যগুলির ধারাবাহিক ইতিহাস রচনাশ্রমেরে অধ্যাপক শ্রীআন্তোভোষ ভট্টাচার্য মহাশয় বাঙলার

১। History of Bengal (Dacca University), Vol. I. p. 409।

২। বাঙালীর ইতিহাস (প্রথম সংস্করণ), পৃ: ৬২৭।

লৌকিক ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্পর্কে একটি অতি মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে “বাংলার প্রাচীন ভাষ্যের মধ্যে রেবন্ত নামক এক দেবতার অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। কতগুলি অর্কাটীন পুরাণের মতে তিনি সূর্যের পুত্র। তাঁহার নামের ব্যুৎপত্তিগত কোনও সম্ভব অর্থ সংস্কৃত অভিধানে সন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না।.....অস্বাভাবিক হইয়াছে যে, ইনি বাংলার লৌকিক ধর্ম (folk religion) হইতে ক্রমে অর্কাটীন পুরাণের মধ্যে স্থান লাভ করিয়াছেন—তাঁহার পূজা সূর্য্যপূজারই অঙ্গ হইয়া গিয়াছে।” দেখা যাচ্ছে যে, একটি বিষয়ে উপরিউক্ত পণ্ডিতগণের পরস্পরের মতের মিল রয়েছে। এঁরা সকলেই মনে করেন যে, রেবন্ত মূলতঃ লৌকিক ধর্ম ও সংস্কৃতির দেবতা এবং পরবর্তী কালে পুরাণকারগণের কল্পায় তিনি দ্বৈতধর্ম ও সংস্কৃতির গভীর মধ্যে প্রবেশ ও স্বীকৃতি লাভ করেছেন। আলোচনাশ্রমকে এই সিদ্ধান্তের সত্যাসত্য বিচার আমাদের করে দেখতে হবে।

রেবন্ত বৈদিক দেবতা নন। বৈদিক সাহিত্যে তাঁর কোনও উল্লেখ নেই। ঋগ্বেদে ‘রেবতী’ নামী এক দেবীর সন্ধান পাওয়া যায় (যথা “...স্বস্তি পথ্যে রেবতি”)*। কিন্তু বৈদিক রেবতীর সঙ্গে পরবর্তী কালের রেবন্তের আত্মীয়তার কোনও সূত্রই খুঁজে পাওয়া যায় না। ভাবতবর্ষে রেবন্তের পূজা ও কাহিনী প্রচলিত হয়েছিল বৈদিক যুগের অনেক পরে। স্মৃত্যুগে তাঁর সম্পর্কে তথ্যাদি অল্পসন্ধান করবার প্রযত্ন ক্ষেত্র বেদোক্ত সংস্কৃত সাহিত্য এবং প্রধানতঃ পৌরাণিক সাহিত্য। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতিষী বরাহমিহির তাঁর ‘বৃহৎসংহিতা’ গ্রন্থে নানা দেবমূর্তির লক্ষণ বর্ণনা শ্রমকে রেবন্তের উল্লেখ ও নিম্নলিখিত বর্ণনা করেছেন† :

রেবন্তোহিবাক্কটো যুগলাক্ষীভাদি পরিবারঃ।

ভাষ্যের দিক থেকে বরাহমিহিরের এই বর্ণনার মূল্য সম্পর্কে আমরা যথাস্থানে আলোচনা করব। বর্তমানে এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, বৃহৎসংহিতার রচনাকাল সম্পর্কে আমাদের অনির্দিষ্ট ধারণা থাকায়, বরাহমিহিরের উক্তি থেকে আমরা জানতে পারি যে, খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে রেবন্ত অন্ততঃপক্ষে উত্তর-ভারতের দেবমণ্ডলীর মধ্যে স্থান পেয়েছেন। প্রতিমাশিল্পের আলোচনাশ্রমকে বরাহমিহির অবশ্য রেবন্তের যে উল্লেখ করেছেন, তা অতি সংক্ষিপ্ত। তাঁর জন্মকাহিনী ও জীবনবৃত্তান্ত সম্পর্কে তিনি নীরব। এ বিষয়ে নানা তথ্য পরিবেষণ করে আমাদের অভাব মিটিয়েছে বিভিন্ন পুরাণ। পৌরাণিক সাহিত্যে রেবন্তকে সূর্য্যপুত্র বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তবে তাঁর মাতৃপরিচয় সর্বত্র এক নয়। কতগুলি পুরাণের সাক্ষ্য অমুসারে রেবন্ত সূর্য্যপত্নী বিশ্বকর্মার কন্যা সংজ্ঞার গর্ভজাত।‡

৩। বাঙলা শব্দলকার্যের ইতিহাস (দ্বিতীয় সংস্করণ), পৃ: ৩২৫।

৪। ঋগ্বেদ, ৫।৫।১৪।

৫। বৃহৎসংহিতা, ৫।৫।৫ (কার্ণ-সম্পাদিত সং, পৃ: ৩২২)।

৬। বিষ্ণুপুরাণ ৩।২।৭ (জীবনলক্ষণ বিভাগাগরকৃত সং, পৃ: ৩৪৭); মার্কণ্ডেয়পুরাণ ৭।১২৩; ১০।৮।১১ (নিরুপেক্ষ ধর্মসংহিতা-সং, পৃ: ১১৭, ১৫১); শিবপুরাণ-ধর্মসংহিতা ১১।৩৪ (বঙ্গবাসী সং, পৃ: ১০৭২); স্বল্পপুরাণ,

স্বাভাব্য হুই একটি পুরাণে রেবন্তকে সূর্যের অপর এক পত্নী রৈবত নামক রাজার কন্যা রাজ্যীর পুত্র বলেও বর্ণনা করা হয়েছে।^১ এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, পৌরাণিক সাহিত্যে কোথাও কোথাও 'রেবন্ত' নামটির 'রেবত'রূপ পাঠভেদ দেখা যায়। রেবন্ত আর রেবত যে অভিন্ন, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কেন না, তাঁদের জন্মবৃত্তান্তে ও যাত্-পরিচয়ে অনেকখানি সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। রেবন্তের উপরিউক্ত দ্বিতীয় পরিচয়ের নজিরে, কয়েকটি পুরাণের মতে 'রেবত' সূর্য ও তাঁর পত্নী রাজ্যীর সন্তান।^২ কালিকাপুরাণের বঙ্গবাসী সংস্করণে 'রেবন্তের' স্থলে 'রেমন্ত'রূপ অন্তর্ভুক্ত পাঠ স্থান পেয়েছে। যাই হোক, এই দেবতার মূল নামটি যে রেবন্ত, এ বিষয়ে বড় একটা সন্দেহ নেই। খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতকে বরাহমিহির তাঁকে এই নামেই উল্লেখ করেছেন। অবিকাংশ পুরাণেও এই নামটিই ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। বর্তমান প্রবন্ধে এই প্রাচীন লোকপ্রসিদ্ধ ও বহুলপ্রচারিত নামই গ্রহণ করা হয়েছে।

হুই একটি পুরাণে রাজ্যীর পুত্র বলে বর্ণিত হলেও, বিশ্বকর্মা-কন্যা সংজ্ঞার পুত্র হিসাবেই রেবন্ত পৌরাণিক ঐতিহ্যে অধিকতর প্রসিদ্ধ। সূর্যের ঠরসে সংজ্ঞার গর্ভে তাঁর জন্ম সম্পর্কে পুরাণে একটি বিস্তারিত আধ্যাত্মিক পাওয়া যায়। সংক্ষেপে তা এই : "বিশ্বকর্মা পুত্রী সংজ্ঞার সূর্যের সঙ্গে বিবাহ হয়। বৈবস্বত মনু, যম ও যমুনা নামে তাঁদের হুই পুত্র ও এক কন্যা জন্মায়। সূর্যের অসাধারণ জ্যোতিঃ সহ করা সংজ্ঞার পক্ষে ক্রমশঃ অসম্ভব হয়ে উঠল। তখন তিনি তাঁর নিজদেহ থেকে নিজের এক ছায়া-প্রতীক সৃষ্টি করলেন এবং সেই ছায়াকে সূর্যের নিকট রেখে স্বয়ং পিতৃগৃহে পলায়ন করলেন। সূর্য কিছু দিন এই চাতুরী বুঝতে পারেননি। সংজ্ঞাভ্রমে তিনি ছায়াকে পত্নীরূপে গ্রহণ করে তাঁর সঙ্গে বাস করতে লাগলেন। অবশেষে এক দিন এই ছলনা ধরা পড়ে গেল। অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে সূর্য, সংজ্ঞার অধেষণে স্বস্তর বিশ্বকর্মার আলয়ে উপস্থিত হলেন। বিশ্বকর্মা জামাতাকে সাধুনয়ে জানান যে, তাঁর প্রাণ শুভে সন্মত না পেরে সংজ্ঞা পাগিয়ে তাঁর গৃহে এসেছিলেন ও পরে সেখান থেকে বনে গিয়ে কঠোর তপস্যায় রত আছেন। বিশ্বকর্মা অতঃপর সূর্যকে মিষ্টবাক্যে ভুট্ট করে ভ্রমিয়ন্ত্রে আরোহণ করিয়ে তাঁর তেজ শান্তন করলেন। এই ভাবে সংস্কৃত হয়ে সূর্য সংজ্ঞার অঙ্গসম্মানে নির্গত হলেন। সংজ্ঞা তখন অশ্বিনীমূর্তি ধারণ করে উত্তরকুরু অঞ্চলে বিচরণ করছিলেন। সূর্যও অশ্বরূপ ধারণ করে উত্তরকুরুতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে মিলিত হলেন। অশ্ব ও অশ্বিনীরূপে সূর্য ও সংজ্ঞার এই

আবৃত্ত্য খণ্ড, ২৫৩৩; প্রভাসখণ্ড ১১১২০৬ (বঙ্গবাসী সং, পৃঃ ৩০৭২; সপ্তম ভাগ, পৃঃ ৪৫২২)

কোনও কোনও পুরাণের মতে সংজ্ঞার অপর এক নাম সুরেন্দ্র, বশা, ব্রহ্মপুত্র ৩২ (বঙ্গবাসী সং, পৃঃ ৩১)।

১। কুর্ধপুত্র ১২০১০ (বঙ্গবাসী সং, পৃঃ ১০৭); অগ্নিপুত্র ২৭৩৩ (বঙ্গবাসী সং, পৃঃ ৫৪৫)।

২। লিঙ্গপুরাণ ১৩৫১৪ (বেঙ্কটেশ্বর প্রেস সং, পৃঃ ১৪৫); পদ্মপুরাণ, সৃষ্টিখণ্ড ৮৩৮ (বঙ্গবাসী সং, পৃঃ ৬০); সৌরপুরাণ ৩০৭২৮ (বঙ্গবাসী সং, পৃঃ ৯৬)।

মিলনের ফলে প্রথম অশ্বিনীকুমারদ্বয় ও পরে রেবন্ত জন্মগ্রহণ করলেন। রেবন্ত জন্মকালে অশ্বারূঢ়, কবচমণ্ডিত ও ধনুর্ধারী খড়্গা চৰ্ম্ম প্রভৃতি অস্ত্রে অসজ্জিত ছিলেন।^{১০}

রেবন্তের জন্মবিবরণী ছাড়া তাঁর সম্পর্কে আরও চুচরটি তথ্য পৌরাণিক সাহিত্যে সন্নিবেশিত হয়েছে। স্বন্দপুরাণের আবন্ত্য খণ্ডের বর্ণনায় দেখা যায়, রেবন্ত জন্মগ্রহণ করবার পরে তাঁর দুর্দম প্রতাপে বিশ্বভুবন অস্থির হয়ে উঠেছিল। সমগ্র দেবতা ও মানুসবে পরাজিত করে তিনি বিশ্ব জয় করেন। তাঁর শরীরনির্গত বহিষ্কারা চরাচর দগ্ধ হতে থাকে। নিরুপায় দেবগণ অবশেষে উপায়ান্তর না দেখে ব্রহ্মার শরণাপন্ন হন। ব্রহ্ম তাঁদের শিবের নিকট অভিযোগ জানাতে নির্দেশ দিলেন। সমস্ত ব্যাপার অবগত হইয়া শিব রেবন্তকে আহ্বান করে তাঁকে আদেশ করলেন, তিনি যেন পৃথিবীতে গিয়ে মহাকালবন নামক শিবের অতি প্রিয় স্থানে বাস করেন। মহাকালবনে একটি অতি পবিত্র শিবলিঙ্গ পূর্বে হতেই অবস্থিত ছিল। রেবন্ত শিবের নির্দেশে সেখানে গমন করবার পরে সেই লিঙ্গ 'রেবন্তেশ্বর' নামে জগতে পরিচিত হয়।^{১১} উক্ত পুরাণের প্রভাসখণ্ডে রেবন্ত সম্পর্কে আর একটি চিত্তাকর্ষক কাহিনী আছে। তদনুসারে রেবন্ত খড়্গা, ছত্র ও কবচ ধারণ করে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের পরমুহূর্ত্তেই তিনি পিতার নিকট হতে উত্তম অস্ত্র গ্রহণ করে পলায়ন করেন এবং স্বর্ঘ্যের পক্ষে সেই অশ্বটি তাঁর পুত্রের নিকট হতে উদ্ধার করা কিছুতেই সম্ভব হইল না। তখন স্বর্ঘ্য তাঁর দুই অমুচর দণ্ডী ও পিঙ্গলকে রেবন্তের পশ্চাদ্ভাবন করে যে-কোনও ছিঙ্গপথে অশ্বটিকে ফিরিয়ে আনতে আদেশ করেন। কিন্তু দণ্ডী ও পিঙ্গল বহু চেষ্টা সত্ত্বেও কোনও ছিঙ্গ আবিষ্কার করতে সক্ষম হইলেন না। এদিকে রেবন্ত অশ্বগুপ্তে তাঁর জন্মস্থান উত্তরকুরু থেকে মুহূর্ত্তের মধ্যে লক্ষ বোজন পথ অতিক্রম করে দক্ষিণে প্রভাসক্ষেত্রে এসে উপস্থিত হইলেন। দণ্ডী এবং পিঙ্গলও তাঁকে অনুসরণ করে সেখানে পৌঁছাইলেন। কিন্তু পথশ্রমে ধর্ম্মাজকর্মেবর ও শ্রান্ত হওয়ায় রেবন্ত প্রভাসেই অবস্থান করতে লাগলেন। সেখানে দণ্ডী ও পিঙ্গল সমভিব্যাহারে অশ্বারূঢ় অবস্থায় তিনি (অর্থাৎ তাঁর মূর্ত্তি) প্রতিষ্ঠিত।^{১২} প্রভাসখণ্ডে উক্ত কাহিনীপ্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, রেবন্ত 'রাজা ভট্টারক' বা 'রাজভট্টারিক' নামেও সুপরিচিত ছিলেন। তিনি রাজ্যীর পুত্র হওয়াতেই নাকি এই নাম দুটির উৎপত্তি। অবশ্য এখানে যে রাজ্যীর উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে, তিনি স্বর্ঘ্যের অপরা পত্নী রৈবতরাজতনয়ী পূর্ব্বকথিতা রাজ্যী নন। স্বন্দপুরাণে রেবন্তের জন্ম-প্রসঙ্গে সংজ্ঞাকেই তাঁর মাতা বলিয়া সন্নিহিত বর্ণনা করা হয়েছে। উক্ত পুরাণের মতে সংজ্ঞারই অপর নাম রাজ্যী ("যা সংজ্ঞা সা সূতা রাজ্যী...")।^{১৩} সুতরাং রাজ্যীপুত্র বলতে এখানে সংজ্ঞার পুত্রই বুঝতে হবে। অপেক্ষাকৃত অর্ধাচীন গ্রন্থ দেবীভাগবতে হৈহয়গণের উৎপত্তিপ্রসঙ্গে রেবন্তের সঙ্গে বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মী ও নারায়ণের সাক্ষাৎকারের একটি কাহিনী

১০। স্বন্দপুরাণ, আবন্ত্যখণ্ড, ২।৪৬ (বঙ্গবাসী সং, পঞ্চম ভাগ, পৃঃ ৩০৭২-৭৪)।

১১। স্বন্দপুরাণ, প্রভাসখণ্ড, ১।১১ (বঙ্গবাসী সং, সপ্তম ভাগ, পৃঃ ৪৪২২-২৩)।

১২। স্বন্দপুরাণ, প্রভাসখণ্ড, ১।১২।১ (বঙ্গবাসী সং, সপ্তম ভাগ, পৃঃ ৪৪২৩)।

বাওয়া যায়। উক্ত উপাখ্যান অল্পসারে একদা রেবন্ত স্বর্গীয় অথ উচ্চৈঃশ্রবাস পৃষ্ঠে যারোহণ করে বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুসমীপে গমন করেন। উচ্চৈঃশ্রবাস অতুলনীয় সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া লক্ষ্মী একদৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে রইলেন। তিনি এতই ভয়ানক হয়ে গিয়েছিলেন যে, বিষ্ণু যখন অস্বাক্ষর রেবন্তের পরিচয় পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, তখন কোনও স্তব্ধ হইলেন না। অশ্রের প্রাতি তাঁকে এত গভীরভাবে আসক্ত দেখে বিষ্ণু বিষম ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি লক্ষ্মীকে এই মর্মে শাপ দিলেন যে, অশ্বিনীকপে তাঁকে পৃথিবীতে জন্মভোগ হবে।^{১২} পরে অবশ্য শিবানুগ্রহে বিষ্ণু অশ্বরূপ ধারণ করে পৃথিবীতে এসে অশ্বিনীকপিণী লক্ষ্মীর সঙ্গে মিলিত হন এবং ফলে হৈহয়বংশের প্রতিষ্ঠাতা একবীর বা হৈহয় জন্মগ্রহণ করেন। এই পুত্রজন্মের সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মীর শাপমুক্তি ঘটে।

রেবন্তের স্বরূপ ও পূজা সম্পর্কে কোথাও স্বতন্ত্র ও সুসংবদ্ধ আলোচনা দেখা যায় না।

কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যে (প্রধানতঃ পৌরাণিক সাহিত্যে) অল্প প্রসঙ্গের আলোচনার মধ্যে এ বিষয়ে যে সব ইতিভূতঃ বিক্ষিপ্ত সংবাদ পাওয়া যায়, সেগুলিকে একত্র করলে মোটামুটি আমরা একটা ধারণা করতে পারি। মর্যাদায় রেবন্ত কখনই হিন্দুধর্মের প্রধান দেবমণ্ডলীর (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ইত্যাদির) সমকক্ষ হয়ে উঠতে পারেননি। তাঁকে অপেক্ষাকৃত নিম্ন পর্যায়ের দেবতা বা 'minor deity' বলাই সঙ্গত। পৌরাণিক সাহিত্যে তাঁকে শুষ্কগণের অধিপতি বলে বর্ণনা করা হয়েছে। মার্কণ্ডেয়পুরাণে দেখা যায় যে, তিনি তাঁর পিতা সূর্য্যকর্তৃক ঐ পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন^{১৩}—

শুষ্ককাশিপতিষে চ রেবন্তোহপি নিয়োজিতঃ।

স্কন্দপুরাণের আবস্ত্য খণ্ডে শিব কর্তৃক রেবন্তকে স্বর্গলোকে শুষ্কগণের অধিপত্য প্রদানের উল্লেখ পাওয়া যায়। সেখানে শিব রেবন্তকে বলছেন^{১৪}—

শুষ্ককাশিপতিষু চ স্বর্গলোকে ভবিতসি।

আবার উক্ত পুরাণের প্রভাসখণ্ডে সম্ভবতঃ সূর্য্যকর্তৃকই রেবন্তের শুষ্ককাশিপতিষে নিয়োগের কথা আছে। সেখানে তাঁর জন্ম, প্রভাসক্ষেত্রে আগমন ও সূর্য্যের নিকট হতে তাঁর বরপ্রাপ্তি প্রসঙ্গে বলা হয়েছে^{১৫}—

শুষ্কভট্টারকষে চ রেবন্তো বিনিয়োজিতঃ।

তা ছাড়া স্কন্দপুরাণের ঐ খণ্ডের একই অধ্যায়ে সূর্য্য কর্তৃক রেবন্তকে বরদানের যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তা থেকে রেবন্তের ক্ষমতা ও মাহাত্ম্য সম্পর্কে আমরা কিছু কিছু জানতে পারি। সেখানে রেবন্তের উদ্দেশ্যে সূর্য্যের মুখ দিয়ে বা বলান হয়েছে, তা এই^{১৬}—

১২। দেবীভাগবত, ৩।১।৪৯-৬১ (বঙ্গবাসী সং, পৃ: ২৫৬)।

১৩। মার্কণ্ডেয়পুরাণ, ৭।৮০ ; ১০।৮২০ (নিরপেক্ষ ধর্মসভা-সং, পৃ: ১১৮, ১৫১)।

১৪। স্কন্দপুরাণ, আবস্ত্য খণ্ড, ২।৫০।২৫ (বঙ্গবাসী সং, পঞ্চম ভাগ, পৃ: ৩০৭০)।

১৫। স্কন্দপুরাণ, প্রভাসখণ্ড, ১।১১।২১৫ (বঙ্গবাসী সং, সপ্তম ভাগ, পৃ: ৪৫৯০)।

১৬। স্কন্দপুরাণ, প্রভাসখণ্ড, ১।১১।২১৭-২৮ (বঙ্গবাসী সং, সপ্তম ভাগ, পৃ: ৪৫৯০)।

অন্নণ্যে চ মৰ্যাদাবে বৈরিদম্ম্যতয়েষু চ ।

যাং অগ্নিস্থিতি য়ে মত্যা মোক্ষ্যন্তে তে মৰ্যাপনঃ ॥

ক্ষেময়ন্তিঃ স্বৰ্গং রাজ্যমারোগ্যং কীৰ্ত্তিযুগতিম্ ।

মরণামতিতৃষ্ণং পুজিতঃ সন্তদাশুসি ॥

বর্ণনা পাঠে বুঝা যায় যে, সাধারণতঃ দাবায়ি, শত্রু, দম্ভ্য প্রভৃতির ভীতি নিবারণার্থে জ্ঞানকর্তারূপে রেবন্তকে অর্চনা করবার প্রথা ছিল। তা ছাড়া তিনি স্বধ, কল্যাণ, রাজ্য, আরোগ্য, কীৰ্ত্তি, উন্নতি প্রভৃতি দান করেন, এই জাতীয় ধারণা তাঁর উপাসকমণ্ডলীর মধ্যে স্থান পেয়েছিল। মার্কণ্ডেয়পুরাণেও প্রায় অবিকল অল্পরূপ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।^{১৭} শিবপুরাণে রেবন্তকে ‘ভিবন্তর’ বা চিকিৎসক বলা হয়েছে, যদিও অল্প কোথাও চিকিৎসক হিসাবে তাঁর খ্যাতির উল্লেখ নেই।^{১৮} তবে স্বন্দ ও মার্কণ্ডেয়পুরাণদ্বয়ে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, রেবন্ত তাঁর ভক্তগণকে আরোগ্য দান করে থাকেন। এর সঙ্গে শিবপুরাণে উক্তির খানিকটা সামঞ্জস্য আছে। স্বন্দপুরাণের প্রভাসখণ্ডে এবং আবন্ত্য খণ্ডে রেবন্তের আর একটি বিশেষত্বের উল্লেখ করা হয়েছে। রেবন্ত অশ্বগণের অধিপতি ছিলেন, এবং সমস্ত অশ্বশালাতে বিশেষ করে তাঁর পূজা করার বিধি ছিল। আবন্ত্য খণ্ডে দেখা যায়, শিব রেবন্তকে বলছেন^{১৯}—

অশ্বশালাসু সর্বান্ন পৃথগীয়ো ভবিস্তসি ।

দৃপতীনং গৃহে চৈব বসিস্তসি সুপুজিতঃ ॥

প্রভাসখণ্ডে দেখা যায়, স্বর্গ্য স্বয়ং পুত্র রেবন্তকে অশ্বদের অধিপত্যে প্রতিষ্ঠিত করছেন^{২০}—

এবং পছত্যাশৌ যদ্বাং সংজ্ঞায়াঃ শাস্তিঃ সূতঃ ।

অশ্বানামাধিপত্যে তু ভাহুনা চ নিয়োজিতঃ ॥

প্রভাসখণ্ডে অন্তরে প্রভাসক্ষেত্রেই রেবন্তমূর্ত্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, রাজা অশ্ববৃদ্ধিমানসে তাঁর আরাধনা করবেন^{২১}—

তদ্বাং সর্বপ্রবহ্নেন তমেবারাধয়েদ্যদাঙ্ক ।

নির্বিসয়ং ক্ষেত্রবাসাৰ্থং রাজা বাহুব্বদ্ধয়ে ॥

আবন্ত্য খণ্ডে রেবন্ত কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও পুজিত ‘রেবন্তেশ্বর’ নামক একটি শিবলিঙ্গের উল্লেখ পাওয়া যায়। সেখানে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, ভক্তিতরে রেবন্তেশ্বরের পূজা করলে অশ্ব, বিজয়, যশ প্রভৃতি লাভ হয়^{২২}—

তেষামশ্বা ভবিষ্যন্তি বিজয়ো যশ উজ্জিতম্ ॥

১৭। মার্কণ্ডেয়পুরাণ, ১০।২১-২২ (দ্বিত্যেক ধর্মসভা-সং, পৃঃ ১৫১) ।

১৮। শিবপুরাণ, ধর্মসংহিতা, ১১।৩৪ (বঙ্গবাসী সং, পৃঃ ১০৭৯) ।

১৯। স্বন্দপুরাণ, আবন্ত্য খণ্ড, ২।৫৬২৬ (বঙ্গবাসী সং, পঞ্চম ভাগ, পৃঃ ৩০৭০) ।

২০। স্বন্দপুরাণ, প্রভাসখণ্ড, ১।১১২২০ (বঙ্গবাসী সং, সপ্তম ভাগ, পৃঃ ৪২২০) ।

২১। স্বন্দপুরাণ, প্রভাসখণ্ড, ১।১৬০।৪ (বঙ্গবাসী সং, সপ্তম ভাগ, পৃঃ ৪০০২) ।

২২। স্বন্দপুরাণ, আবন্ত্য খণ্ড, ২।৫৬।০২ (বঙ্গবাসী সং, পঞ্চম ভাগ, পৃঃ ৩০৭০) ।

হুতরাং রেবন্তকে যে বিশেষ করে অশ্বের অধিরক্ষক দেবতা মনে করা হত, এ বিষয়ে দ্বেদে নেই। রেবন্তের পূজাপদ্ধতি সম্পর্কে যে সামান্য তথ্য পাওয়া গিয়াছে, তার থেকে ঠিক বুঝা যায় যে, সে পূজার বড় একটা স্বাতন্ত্র্য ছিল না। কয়েকটি প্রধান দেবদেবীর পূজার অঙ্গরূপেই বেশীর ভাগ সময়ে রেবন্তের অর্চনা করা হত। পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে সূর্যের সঙ্গে রেবন্তের সম্পর্ক অতি অন্তরঙ্গ। হুতরাং রেবন্তপূজায় যে সূর্যপূজাপদ্ধতির অত্যধিক প্রভাব থাকবে, তা খুবই স্বাভাবিক। কালিকাপুরাণের মতে সূর্যপূজাবিধানের দ্বারাই রেবন্তের পূজা কর্তব্য^{২০}—

এবংবিধন্ত রেবন্তং প্রতিমায়াং বটেহপি বা ।

সূর্যপূজাবিধানেন পূজয়েত্তোরগাঙ্করে ।

হুতরাং প্রতিমাকারে বা বটে স্থাপন করে, যে ভাবেই রেবন্তের পূজা করা হক না কেন, এই পুরাণমতে তা সূর্যপূজার বিধিতেই সম্পাদন করতে হবে। স্বন্দপুরাণের প্রভাসখণ্ডে প্রভাসক্ষেত্রে যে রেবন্তমূর্ত্তির উল্লেখ আছে, তার পূজার তিথি দেওয়া হয়েছে রবিবার সপ্তমী^{২১}—

রবিবারেণ সপ্তম্যাং বন্তং পূজয়েত নরঃ ।

তস্তায়য়েহপি নো দেবি দরিত্রী জায়তে নরঃ ॥

সপ্তমী তিথি, পৌরাণিক সৌর ধর্মের একটি বিশিষ্ট ও গুরুত্বপূর্ণ দিন, এবং ঐ তিথিতে সূর্যকে নানা ভাবে অর্চনা করবার প্রয়োজনীয়তা ও তজ্জনিত পুণ্যের কথা শাস্ত্রে বিস্তারিত ভাবে বলা হয়েছে। এই সপ্তমী তিথি উপলক্ষ্যে অনেকগুলি সৌর ব্রত-অমৃত্যুতানের বিধিও পুরাণে এবং স্মৃতিশাস্ত্রে দেথা যায়।^{২২} সূর্যপূজার এই পবিত্র তিথিতে, স্বন্দপুরাণের সাক্ষা অনুসারে, রেবন্তপূজা কর্তব্য। সূর্যপূজার সঙ্গে রেবন্তপূজার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের এও একটি দৃষ্টান্ত। স্বন্দপুরাণের প্রভাসখণ্ডে রেবন্তের যে জন্মকাহিনী দেওয়া আছে, সেই প্রসঙ্গে তাঁর প্রভাসক্ষেত্রে আগমনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। রেবন্ত উত্তরকুরু থেকে প্রভাসক্ষেত্রে এসে উপস্থিত হলে সূর্যের অলুচরবর দণ্ডী ও পিঙ্গল তাঁকে অলুসরণ করে সেখানে আসেন। রেবন্ত পরিশ্রান্ত হয়ে প্রভাসে অবস্থান করলেন এবং তাঁর সঙ্গে উক্ত সূর্য্যলুচরবরও সেখানেই স্থায়ী হলেন^{২৩}—

স্বিন্নগাঙ্কন্ততো দেবি প্রভাসে সমবস্থিতঃ ।

দন্তপিঙ্গলসংযুক্তো হুতরাঙ্কঃ স তিষ্ঠতি ॥

২০। কালিকাপুরাণ, ৮৫।৪৯ (বঙ্গবাসী সং, পৃঃ ৫৫৪) ; এই সংস্করণে রেবন্তকে 'রেবন্ত' বলে উল্লেখ করা হয়েছে, পূর্বেই এ কথা বলেছি।

২১। স্বন্দপুরাণ, প্রভাসখণ্ড, ১।১৬০।৩ (বঙ্গবাসী সং, সপ্তম ভাগ, পৃঃ ৪৮০২)।

২২। এই সম্পর্কে 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা' ৫৭শ বর্ষ, ১ম-২য় সংখ্যা (পৃঃ ২৫-৪৩) প্রকাশিত বর্তমান লেখকের 'ভারতীয় সূর্যপূজার একটি বিশিষ্ট' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

২৩। স্বন্দপুরাণ, প্রভাসখণ্ড, ১।১১।২১৩ (বঙ্গবাসী সং, সপ্তম ভাগ, পৃঃ ৪৫২২)।

এখানে যে প্রতাসক্ষেত্রস্থ কোনও রেবন্তের মূর্তির উল্লেখ করা হচ্ছে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। এই মূর্তি অস্বাক্ষর ছিল এবং তার সঙ্গে দণ্ডী ও পিজলের মূর্তিও যুক্ত ছিল। সাধারণতঃ সূর্য্যপ্রতিমার উভয় পাশে দণ্ডী ও পিজলের মূর্তি স্থাপন করাই রীতি ছিল। দণ্ডী ও পিজলের মূর্তিসংযুক্ত অসংখ্য সূর্য্যমূর্তির আবিষ্কার, তা উদ্ভবরূপে প্রমাণ করেছে। শাস্ত্রেও সূর্য্যের দুই পাশে তাঁর এই দুই অঙ্গের মূর্তি স্থাপন করবার নির্দেশ দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত রেবন্তের কোনও মূর্তির সঙ্গে দণ্ডী ও পিজলের মূর্তি পাওয়া গিয়াছে বলে আমাদের জানা নেই। প্রতাসক্ষেত্রের উক্ত ‘দণ্ডপিজলসংযুক্ত’ রেবন্তমূর্তির বিবরণ পাঠ করে মনে হয়, এখানে সূর্য্যমূর্তির বিশেষত্ব রেবন্তমূর্তিতে আরোপিত হয়েছিল। হয় ত বা সূর্য্যছত্রবায়ের মূর্তিশোভিত এই জাতীয় রেবন্তমূর্তি মাঝে মাঝে নির্মিত হত, যদিও ভাস্কর্য্যের দিক থেকে তার কোনও নিদর্শন আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। সূর্য্যপূজা যে কত গভীরভাবে রেবন্তপূজাকে প্রভাবিত করেছিল, প্রতাসক্ষেত্রের দণ্ডপিজলসংযুক্ত রেবন্তমূর্তির বর্ণনা সন্দেহাতঃ আমাদের তা বুঝতে সাহায্য করে। কালিকাপুরাণে দেখা যায় যে, হুর্গাপূজার পরে যে সপ্তদিবসব্যাপী নীরাঞ্জন অমুষ্ঠানের বিধি আছে, তার সপ্তম দিবসে রেবন্তপূজার বিধান দেওয়া হয়েছে^{২১}—

পূর্ব্বোক্তানান্ত দেবানাং সঙ্গাহং যাবচ্ছতম্।

সপ্তমেহি তু রেবন্তং পূজয়েত্তোরণান্তরে ॥

আখিন মাসে সাময়িক প্রস্তুতির অঙ্গরূপ সাধারণতঃ এই মাজলিক অমুষ্ঠান পালন করা হত। প্রধানতঃ রাজারা ও সেনাপতিগণ এই ব্যাপারে অগ্রণী ছিলেন। কেন না, এই সময়ই তাঁদের দিগ্বিজয়যাত্রা ইত্যাদির পক্ষে প্রস্তুত কাল। এই উপলক্ষ্যে শোভাযাত্রা, সৈন্যগণের কুচ্কাওয়াজ, বৃদ্ধাঙ্গিনীর প্রভৃতিও অমুষ্ঠিত হত। তাঁর যুদ্ধাংকে উদ্বেগ করে রাজাকে বলতে হত^{২২}—

যেন সত্যেন রেবন্তং যেন সত্যেন ভাস্করম্।

বহসে তেন সত্যেন বিজরায় বহস্ব মাধ্ ॥

“যে সত্যের দ্বারা ভাস্কর ও যে সত্যের দ্বারা রেবন্তকে তুমি বহন কর, সেই সত্যের দ্বারা তুমি আমাকেও বহন কর।” সুতরাং দেখা যাচ্ছে, হুর্গাপূজা ও তৎসংক্রান্ত আচার অমুষ্ঠানের সঙ্গে রেবন্তপূজার পরোক্ষ সংলগ্ন ছিল, এবং অন্ততঃ কোনও কোনও মতে উপসংহারে রেবন্তপূজামুষ্ঠান না হলে, নীরাঞ্জনবিধি অসম্পূর্ণ থাকত। রঘুনন্দন তাঁর ‘তিথিতত্ত্ব’ গ্রন্থে (রচনাকাল খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধ) উল্লেখ করেছেন যে, কোজাগরী পূর্ণিমার রাত্রিতে লক্ষ্মাপূজার পূর্বে দ্বারোপান্তে বিত্তশালী এবং অশ্বের অধিকারী ব্যক্তিগণ কর্তৃক রেবন্তের পূজা কর্তব্য^{২৩}—

২১। কালিকাপুরাণ, ৮৫।৪৬ (বঙ্গবাসী সং, পৃঃ ৫৫৪)।

২২। কালিকাপুরাণ, ৮৫।৪৬ (বঙ্গবাসী সং, পৃঃ ৫৫৪)।

২৩। তিথিতত্ত্ব (অষ্টাবিংশতিতত্ত্বানি,—শ্রীহরিশঙ্কর-নাং, প্রথম খণ্ড) পৃঃ ৮৭।

দারোপান্তে সুদীপ্ত সংপূজ্যো হব্যাবহনঃ ।

যবাক্ততত্ত্বতোপেতৈস্তুলৈশ্চ সুভগিতঃ ।

সংপূজিতব্যঃ পূর্ণেশুঃ পয়সা পারসেন চ ।

কল্পঃ সম্ভার্যকল্পশ্চ তথা নন্দীশ্বরো মুনিঃ ।

গোমন্তিঃ সুরভিঃ পূজ্যো হাগবন্তিহঁতাশনঃ ।

উরভবন্তির্করুণো গজবন্তির্বিদায়কঃ ।

পূজ্যঃ সাতৈশ্চ রেবন্তো যথাবিভববিস্তয়েঃ ॥

অতরাং কোজাগরী পূর্ণিমায় লক্ষ্মীপূজার সঙ্গেও রেবন্তপূজার পরোক্ষ সংশ্লষ যে কোনও কোনও মতে স্বীকৃত হত, এ কথা বেশ বুঝা যাচ্ছে। স্বল্পপুরাণের আবস্ত্য খণ্ডে উল্লিখিত শিব ও রেবন্তের যোগাযোগের কথা পূর্বেই বলেছি। সেখানে দেখা যায়, শিব কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে রেবন্ত মহাকালবন নামক স্থানে এলেন এবং ঐ স্থানে এক অপূর্ব জ্যোতির্ষ্ময় শিবলিঙ্গ দেখতে পেলেন। তিনি সেই লিঙ্গের অর্চনা করেন এবং উত্তরকালে সেই লিঙ্গ ‘রেবন্তেশ্বর’ নামে পৃথিবীতে পরিচিত হল। এই কাহিনীর মধ্যে সম্ভবতঃ শিবপূজা ও রেবন্তপূজার সংমিশ্রণের কিছু ইঙ্গিত থাকতে পারে।^{৩০} এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা চলে যে, অগ্নিপু্রাণে নানাশ্রকার দামের মাছাশ্র্য বর্ণনার মধ্যে বলা হয়েছে যে, ব্রাহ্মণকে অশ্রাকৃত রেবন্তের স্বর্ণমূর্ত্তি দান করলে দাতার কখনও মৃত্যু হয় না^{৩১}—

রেবন্তাবিষ্ঠিতকাঞ্চং হৈমং দত্ত্বা ন মৃত্যুভ্যাক্ ।

উপরের আলোচনা থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে, মূল্যতঃ সূর্য্যপূজার সঙ্গে ও গৌণতঃ অপর কয়েকটি দেবদেবীর পূজার সঙ্গে রেবন্তপূজার সংযোগ বর্ত্তমান ছিল।

আজ পর্য্যন্ত রেবন্তের যে মূর্ত্তিগুলি আবিষ্কৃত হয়েছে, ভাস্কর্য্যের দিক্ থেকে তার কিছু কিছু আলোচনা অনেকেরই করেছেন। পূর্বে রেবন্তের এই মূর্ত্তিগুলিকে বিষ্ণুর কছি অবতারের মূর্ত্তি মনে করা হত। বরাহমিহির তাঁর বৃহৎসংহিতায় রেবন্তের যে সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করেছেন, তার উপর ভিত্তি করে মূর্ত্তিগুলিকে রেবন্তের ব’লে প্রথম নির্দিষ্ট করেন বোধ হয় পণ্ডিত বিনোদবিহারী বিজ্ঞাবিনোদ।^{৩২} রেবন্ত সম্পর্কে বরাহমিহিরের উক্তি পূর্বেই উদ্ধৃত করা হয়েছে। তাঁর মতে ‘রেবন্ত অশ্রাকৃত এবং শৃগরাক্রীড়াবিমুক্ত পরিবার-সমন্বিত হবেন।’ কয়েকটি পুরাণে রেবন্তের অতুল বর্ণনা পাওয়া যায়। সেখানে তাঁকে অশ্রাকৃত, কবচমণ্ডিত এবং খড়্গ ধনুক তুল প্রভৃতি অস্ত্রধারিক্রূপে কল্পনা করা হয়েছে। কালিকাপুরাণের বিবরণ অপেক্ষাকৃত বিস্তারিত^{৩৩}—

৩০। স্বল্পপুরাণ, আবস্ত্যখণ্ড, ২।৫৬।২৩-৩২ (বঙ্গবাসী সং, পঞ্চম ভাগ, পৃঃ ৩০৭৩) ।

৩১। অগ্নিপু্রাণ, ২।১।১৮ (বঙ্গবাসী সং, পৃঃ ৪০০) ।

৩২। Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1909, pp. 391-92.

৩৩। কালিকাপু্রাণ, ৮।৫।৪৭-৪৮ (বঙ্গবাসী সং, পৃঃ ৫৫৪) ।

অৰ্ঘ্যপুঞ্জং মহাবাহুং হিতুজং কবচোচ্ছলম্ ।

অলম্ব্যং শুক্লবস্ত্রং কেশাদ্ভূষণাং বাসসা ॥

কশাং বামকরে বিদ্রুজ্জিহ্বং তু করং পুনঃ ।

স খণ্ডং ভক্ত বামায়াং সিতসৈন্ধবসংস্থিতম্ ॥

এই বর্ণনা অম্বুসারে, রেবন্ত হিতুজ, কবচমণ্ডিত এবং শুক্ল অশ্ব আরুঢ়; তিনি উচ্ছলকাণ্ডি ও তাঁর কেশরাশি শুক্ল বস্ত্রে সংবৃত; তাঁর বাম হস্তে কশা ও দক্ষিণ হস্তে খড়্গ। বরাহমিহির ও পুরাণকারগণ রেবন্তকে যে ভাবে বর্ণনা করেছেন, তার সঙ্গে রেবন্তের এষাবৎ আবিষ্কৃত মূর্তিগুলির যথেষ্ট সঙ্গতি আছে। বিহারে আবিষ্কৃত মূর্তিগুলিতে দেখা যায়, রেবন্ত অশ্বপৃষ্ঠে সমাসীন এবং তাঁর অম্বুচরবৃন্দ পদব্রজে তাঁকে অম্বুগমন করছেন। শেবোক্তগণের মধ্যে জী, পুরুষ, উভয় শ্রেণীই বিদ্যমান। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ মৃদঙ্গ ও করতাল বাজাচ্ছেন। একজন রেবন্তের মস্তকে ছত্র ধারণ করেছেন। দলের সঙ্গে একাধিক কুকুরও চলেছে। দেবতাদের একজন অম্বুচরের স্বন্ধে সম্ভবতঃ একটি মৃত বরাহ। অপর এক অম্বুচর সম্মুখে একটি মৃগের প্রীতি শরসন্ধান করছেন। অথারোহী দেবতার দক্ষিণ হস্তে একটি পাত্র। পণ্ডিত বিভাবিনোদ অম্বুমান করেন, এটি সম্ভবতঃ জলপাত্র। রেবন্তের পদদ্বয় আজাদ পাদুকা (বুট জুতা) দ্বারা আবৃত। সশস্ত্র অম্বুচর, কুকুর, বাঙতাণ্ড, মৃগ, মৃত বরাহ প্রভৃতি দেখে বুঝতে বাকী থাকে না যে, শিল্পী সাহুচর রেবন্তের মৃগয়ারত মূর্তি উৎকীর্ণ করেছেন, এবং তাঁকে প্রেরণা ঘূগিয়েছে বরাহমিহিরের পূর্বোক্ত বর্ণনা। বাদলা দেশের ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত বড়কামতায় এই জাতীয় একটি রেবন্তমূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে।^{৩৪} দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত খাটনগর থেকে রেবন্তের যে মূর্তিটি আবিষ্কৃত হয়েছে, সেটি এর থেকে কিছু ভিন্ন রকমের। এ ক্ষেত্রেও রেবন্ত অশ্বারুঢ় এবং তাঁর পদদ্বয় আজাদ পাদুকাবৃত; তাঁর দক্ষিণ হস্তে কশা ও বাম হস্তে অশ্বের বলুগা; একজন অম্বুচর তাঁর মস্তকে ছত্র ধারণ করে আছে। তাঁর সম্মুখে ও পশ্চাতে দুজন দম্ভ্য তাঁকে আক্রমণ করতে উত্তত হয়েছে; পশ্চাতে দম্ভ্যটি বৃক্ষারুঢ়; তাঁর পদমূলে একটি দণ্ডায়মানা জীমূর্তি, একজন ভক্তের মূর্তি ও চাল-তরবারিধারী একটি মম্বুয়মূর্তি; তৃতীয় ব্যক্তি বটিতে মংগুকর্ষনরতা এক জীলোককে আঘাত করতে উত্তত। উপরে বেরন্তের সম্মুখে সম্ভবতঃ একটি বাসগৃহ ও তার মধ্যে সম্ভবতঃ একটি দম্পতি।^{৩৫} স্বন্দ ও মার্কণ্ডেয় পুরাণদ্বয়ে রেবন্তকে শত্রু ও দম্ভার হাত থেকে সাধারণের জ্ঞাপকর্তা বলা হয়েছে, আলোচনা প্রসঙ্গে সে কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। এই মূর্তির নির্মাতা সম্ভবতঃ সেই বর্ণনা দ্বারা অম্বুপ্রাণিত হয়েই শত্রু ও দম্ভ্যউপকৃত গৃহস্থের আশ্রয়স্থলরূপে রেবন্তমূর্তির পরিকল্পনা করেছেন। মংগুকর্ষনরতা নারী, গৃহস্থে অবস্থিত দম্পতি প্রভৃতি একান্ত গার্হস্থ্য চিত্রগুলির ব্যাখ্যা এই ভাবেই করা সম্ভব। এই

৩৪। J. A. S. B. 1909, p. 392; N. K. Bhattasali, Iconography of Buddhist and Brahmanical Sculptures in the Dacca Museum, p. 177.

৩৫। History of Bengal (Dacca University), Vol. I. pp. 458-59,

মূর্তিটি বর্তমানে রাজশাহী চিত্রশালায় রক্ষিত। সম্ভবতঃ এই মূর্তিটিকেই স্বর্গীর নলিনী-কান্ত ভট্টশালী বটুকর্ভৈরবের মূর্তি বলে উল্লেখ করিয়াছিলেন।*^{৩০} কিন্তু এ উক্তি যে ভুল, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। ঐ মূর্তিটির সঙ্গে বটুকর্ভৈরবের কোনও সম্পর্ক নেই। এই প্রসঙ্গে ৮ ভট্টশালী মহাশয়ের আর একটি ভ্রমাত্মক ধারণার কথাও বিচার্য। উদ্ভিঘার সুবিখ্যাত কোণার্ক সূর্যমন্দিরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে প্রধান দেউলের উত্তর পার্শ্বদেবতারূপে একটি অশ্বারোহী মূর্তি এখনও বিদ্যমান। ৮ ভট্টশালী মহাশয় এটিকে রেবন্তের মূর্তি বলে নির্দিষ্ট করেছেন।*^{৩১} কিন্তু এটি মোটেই রেবন্তমূর্তি নয়, আসলে অশ্বারূঢ় সূর্য্যমূর্তি। সূর্য্যের অশ্বপৃষ্ঠে সমাসীন এই আত্মীয় মূর্তি বিরল এবং ভারতীয় শিল্পের ঐতিহ্যে এর নাম হরিদম্ব। কোণার্কের উল্লিখিত মূর্তিটির শেষোক্ত পরিচয় পণ্ডিতসমাজে সর্বস্বীকৃত।*^{৩২} অগ্নিপূরণের নিম্নোক্ত বচনে শিল্পিগণের প্রতি এই ধরনের মূর্তি নির্মাণ করবার স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে*^{৩৩}—

অথবাস্থমাক্রুচঃ কার্য্য একস্ত ভাস্করঃ ।

সুতরাং অশ্বারোহী হলেই কোনও দেবমূর্তিকে রেবন্ত বলে চিহ্নিত করা সর্বদা নিরাপদ নয়; মূর্তিশিল্পের ক্ষেত্রে রেবন্ত ও হরিদম্বের পার্থক্য সম্পর্কে আমাদের সচেতন থাকা উচিত।

রেবন্ত পূজার প্রাচীনত্ব সম্পর্কে আলোচনার প্রধান বিপদ এই যে, রেবন্ত যে সকল গ্রন্থাদিতে উল্লিখিত ও বর্ণিত হয়েছে, তার প্রায় কোনটির সঠিক রচনাকাল আমাদের জানা নেই। পৌরাণিক সাহিত্যের মধ্যে বিষ্ণু, পদ্ম, লিঙ্গ প্রভৃতি পুরাণগুলির অতি সংক্ষিপ্ত উল্লেখ এবং কলিকাপুরাণ বা দেবীভাগবতের মত অর্ধপ্রাচীন গ্রন্থের বিস্তারিত বর্ণনার কথা বাদ দিলে, মার্কণ্ডেয় এবং স্বল্পপুরাণদ্বয়ের সাফ্যই এ ক্ষেত্রে বিশেষরূপে বিবেচ্য। স্বল্প-পুরাণে রেবন্ত সম্পর্কে নানা তথ্য পাওয়া গেলেও, তার দ্বারা রেবন্তোপাসনার প্রাচীনত্ব প্রমাণিত হয় না। কেন না, পুরাণগুলির মধ্যে স্বল্পপুরাণ অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালে রচিত। কিন্তু মার্কণ্ডেয় পুরাণ সম্পর্কে ঠিক এ কথা বলা চলে না। পৌরাণিক সাহিত্যের প্রাচীনতম গ্রন্থগুলির মধ্যে মার্কণ্ডেয় পুরাণ যে অঙ্গতম, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। লক্ষ্য করবার বিষয়, এই পুরাণে দুই স্থানে, ৭৮ সংখ্যক ও ১০৮ সংখ্যক অধ্যায়দ্বয়ে, রেবন্তপ্রসঙ্গ সন্নিবেশিত হয়েছে। ১০৮ সংখ্যক অধ্যায়ের বিবরণের সঙ্গে স্বল্পপুরাণের অন্তর্গত

৩০। Bhattasali, Iconography p. 174 n ; রেবন্তমূর্তির নিম্নোল্লিখিত চিত্রগুলি এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য : J. A. S. B. 1909, Plate XXX ; Bhattasali, Iconography, Plate LXII(a) ; History of Bengal (Dacca University), Vol. I, Plate XVI, 42.

৩১। Bhattasali, Iconography, p. 176.

৩২। M. N. Ganguli : Orissa and Her Remains, pp. 448-49 ; নির্মলকুমার বহু : কণায়কের বিবরণ, পৃঃ ৭৪।

৩৩। অগ্নিপূরণ, ৫১।৩ (বঙ্গবাসী সং, পৃঃ ১০৩)।

প্রভাসখণ্ডে প্রাপ্ত বর্ণনা যে হুবহু মিলে যায়, এ কথা পূর্বেই বলেছি। মার্কণ্ডেয় পুরাণের দুটি অধ্যায়ের বর্ণনায় মধ্যেও বহু সাদৃশ্য আছে, যদিও ১০৮ সংখ্যক অধ্যায়ে আমরা রেবন্তের স্বরূপ সম্পর্কে যে দুটি শ্লোক পাই, ৭৮ সংখ্যক অধ্যায়ে তা নেই।^{৪০} একই পুরাণের বিভিন্ন অংশে একটি প্রসঙ্গ প্রায় একই ভাষায় দুই বার উল্লিখিত হতে দেখলে, সহসা সন্দেহ হতে পারে যে, বিষয়টি বোধ করি প্রক্ষিপ্ত। কিন্তু মার্কণ্ডেয় পুরাণের বস্তুগুলি সংকরণ দেখবার সুযোগ হয়েছে, সবগুলিতেই অবিকল ঐ একই ব্যাপার লক্ষ্য করেছে।^{৪১} সুতরাং ঐ অংশগুলি মূল গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত নয়, এ-জাতীয় অনুমান করতেও একটু দ্বিধা হয়। পাশ্চাত্য পুরাণবিদ পাণ্ডিটার সিদ্ধান্ত করেছেন যে, বর্তমান মার্কণ্ডেয় পুরাণের ৪৫ থেকে ৮১ সংখ্যক, এবং ৯৩ থেকে ১০৮ সংখ্যক অধ্যায়গুলিই মূল গ্রন্থে ছিল। বিস্তারিত আলোচনার পর তিনি এই মতও প্রকাশ করেছেন যে, মার্কণ্ডেয় পুরাণের রচনাকাল সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতক।^{৪২} রেবন্তসম্পর্কিত তথ্যসম্বন্ধিত অংশগুলি (৭৮ ও ১০৮ সংখ্যক অধ্যায়) পাণ্ডিটারের হিসাব অনুসারে, মার্কণ্ডেয় পুরাণের মূল গ্রন্থেরই অঙ্গ। যদি মার্কণ্ডেয় পুরাণের রচনাকাল সম্পর্কে পাণ্ডিটারের মত গ্রহণ করা যায়, তা হলে আমাদের সিদ্ধান্ত করতে হয় যে, খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকেই রেবন্ত ভারতীয় ঐতিহ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং তাঁর অম্মকাহিনী, আকৃতি, পোষাক পরিচ্ছদ, বাহন, গুহাকাশিপতিত্ব, মাহাত্ম্য প্রভৃতি সব কিছু সম্পর্কেই ঐ সময়ে কতগুলি সুস্পষ্ট সংস্কার চলতি হয়ে গিয়েছিল। বরাহমিহির তাঁর বৃহৎসংহিতা গ্রন্থে রেবন্ত সম্পর্কে যে উক্তি করেছেন, তা অতি সংক্ষিপ্ত হলেও গুরুত্বপূর্ণ। কেন না, আমরা নিশ্চিত জানি যে, বরাহমিহির খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের মধ্যভাগের লোক। সুতরাং খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকেও রেবন্তের সন্দেহাতীত উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। বরাহমিহির কি ভাবে রেবন্তের মূর্তি নির্ধারণ করতে হবে, তারও স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং প্রমাণিত হচ্ছে যে, খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে রেবন্তের মূর্তিনির্ধারণপ্রাণীও বিবিধ হয়ে পড়েছিল, এবং ঐ সময়ে, কি তারও পূর্বে হতে রেবন্তের মূর্তি উদ্ভবভারতে নিশ্চিত হত। মার্কণ্ডেয় পুরাণে রেবন্ত সম্পর্কে যে সকল কিংবদন্তী আছে, তার মধ্যে দেখা যায় যে, তিনি তাঁর পিতা সূর্য্য কর্তৃক গুহকগণের অধিপতি নিযুক্ত হয়েছিলেন। আশ্চর্যের বিষয়, মহাভারতে দেখা যায়, গুহকগণের অধিপতি কুবের, রেবন্ত নয়।^{৪৩} বর্তমান মহাভারতে এক লক্ষ শ্লোক থাকায়

৪০। মার্কণ্ডেয় পুরাণ, ১০৮২১-২২ (নিয়োগ্য বর্ধসভা-সং, পৃ: ১৫১); স্বপ্নপুরাণেও (প্রভাসখণ্ড, ১১১১২১-১৮) এই শ্লোক দুটি আছে এবং এ প্রবন্ধে পূর্বেই সেগুলি উদ্ধৃত করা হয়েছে। সেখানে রেবন্ত শব্দ দ্বারা দাবাঘি প্রভৃতির হাত থেকে আশ্রয় ও হুখ কল্যাণ রাজ্য আরোগ্য প্রভৃতির বিতরণকারী রূপে বর্ণিত হয়েছেন।

৪১। উদাহরণস্বরূপ ঐষ্টব্য মার্কণ্ডেয়পুরাণ (বদ্বাসী সং) পৃ: ১২৮, ১৬৪; (বিশিষ্টাধিকা ইতিকা সং) পৃ: ৪১২-২০, ৫০২-৪০; (জীবানন্দ বিভাগ্যসং-কৃত সং) পৃ: ৩২০-২১, ৫০৮-৪; (বেকটেশ্বর প্রেস সং, বোম্বাই) পৃ: ১০৭, ১০৮-৩৭।

৪২। Pargiter, Markandeya Purana (English translation, Calcutta, 1904), Introduction, pp. iv, xlv.

৪৩। Hopkins-Epic Mythology, p. 147.

ক শতসাহস্রী সংহিতা বলে অভিহিত করা হয়। ২১৪ গুপ্তসংবতে (অর্থাৎ ৫৩৩-৩৪ ঠাণ্ডে) উৎকীর্ণ মধ্যভারতের নাগোধ রাজ্যের অন্তর্গত ধোহতে প্রাপ্ত মহারাজ নরনাথের তাম্রশাসনে মহাভারতকে লক্ষলোকসংলিত বলে উল্লেখ করা হয়েছে।^{৪৪} তরাং দেখা যাচ্ছে, খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের প্রথমার্ধে মহাভারত তার বর্তমান আকার লাভ রেছিল, কিন্তু এতে গুহ্যকগণের সম্পর্কে রেবন্তের উল্লেখ মাত্র নেই, অধিকন্তু গুহ্যকগণের খিনায়কত্ব সম্পর্কে এক স্বতন্ত্র ঐতিহ্য স্থান পেয়েছে। পার্সিটারের মতামতসারে মার্কণ্ডেয় রাণস্থ রেবন্তগ্রন্থের কাল যদি খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতক ধরা যায়, তা হলে মহাভারতের লক্ষ্যের সঙ্গে তার সঙ্গতির অভাব সহজেই চোখে পড়ে। লক্ষ্য করবার বিষয়, বরাহমিহির যং রেবন্ত সম্পর্কে খুবই সংক্ষেপে উক্তি করেছেন এবং তাঁকে গুহ্যকাধিপতি ইত্যাদি বংশেষণে অভিহিত করেননি। বরাহমিহিরও খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের মধ্যভাগের লোক। এই রূপারে চরম মীমাংসার উপনীত হওয়া বোধ করি, এখন পর্যন্ত সম্ভব নয়। তবে যেকটি আত্মমানিক সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে। প্রথমতঃ এরকম হতে পারে যে, মার্কণ্ডেয় পুরাণের রচনাকাল সম্পর্কে পার্সিটারের মত ভ্রান্ত এবং এ গ্রন্থ আরও পরবর্তী কালের রচনা। দ্বিতীয়তঃ এও অসম্ভব নয় যে, মার্কণ্ডেয় পুরাণের রচনাকাল সম্পর্কে পার্সিটারের অনুমান নিতুল, কিন্তু রেবন্ত গ্রন্থ মার্কণ্ডেয় পুরাণের মূল গ্রন্থের অংশ নয়, পরবর্তী কালে প্রক্ষিপ্ত। তৃতীয়তঃ যদি ধরে নেওয়া যায় যে, মার্কণ্ডেয় পুরাণের ও ঐ গ্রন্থস্থ রেবন্তকাহিনীর রচনাকাল খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর পরবর্তী নয়, তা হলে সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও স্বীকার করতে হয় যে, রেবন্ত তখনও উত্তরভারতীয় ঐতিহ্যে অল্প পরিচিত ছিলেন এবং তাঁর সম্পর্কে মার্কণ্ডেয় পুরাণে প্রাপ্ত কাহিনীগুলি তখনও বহুল প্রচলিত বা সর্বস্বীকৃত হয়নি। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে, পূর্ণাঙ্গ মহাভারতের অনুলেখ^{৪৫} ও প্রায় ঐ একই সময়ে বরাহমিহিরের অতি সংক্ষিপ্ত উল্লেখ, হয় ত সেই রকমই ইঙ্গিত করে। হয় ত চতুর্থ খ্রীষ্টাব্দ বা তার কাছাকাছি কোনও সময়ে রেবন্তের কাহিনী ও ঐতিহ্যের জন্ম এবং তার পর কয়েক শতাব্দী ধরে রেবন্তের কাহিনী ও পূজা ক্রমশঃ অধিক প্রচারিত ও প্রসারিত হয়ে চলে এবং ক্রমশঃ খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের (পূর্ণাঙ্গ মহাভারত ও বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতা রচিত হওয়ার) বেশ কিছু কাল পরে রেবন্ত উত্তরভারতীয় দেবমণ্ডলীর মধ্যে স্থায়ী আসন গ্রহণ করেন। রেবন্তপূজার ও রেবন্তসম্পর্কিত ঐতিহ্যের এই ক্রমপরিবর্তনের ফলে ধীরে

৪৪। Fleet : Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol. III, p, 137.

৪৫। অবশ্য আমার এই উক্তিও অনুমান ছাড়া আর কিছুই নয়। বর্তমান প্রচলিত মহাভারতের লক্ষ লোকের মধ্যে রেবন্তের অনুলেখ দেখে জোর করে এ কথা বলা চলে না যে, খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের প্রথমার্ধেও মহাভারতের লক্ষ লোকের মধ্যে রেবন্তের উল্লেখ ছিল না। এখনকার মহাভারতের সঙ্গে তখনকার মহাভারতের লোকসংখ্যা সমান হলেও, বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে ছুইএর মধ্যে কিছু কিছু গরমিল থাকা মোটেই অসম্ভব নয়। বর্তমান প্রচলিত মহাভারতের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে আমি অনুমান করেছি মাত্র যে, ষষ্ঠ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ণাঙ্গ মহাভারতে সম্ভবতঃ রেবন্তের উল্লেখ ছিল না।

ধীরে এই দেবতা সম্পর্কে কিছু কিছু কাহিনী ও কিংবদন্তী পল্লবিত আকারে পরবর্তী সাহিত্যে স্থান পায়। বর্তমানে রেবন্ত সম্পর্কে আমরা যা জানি, তাতে রেবন্তের পূজা ও ঐতিহ্যে প্রাচীনত্ব সম্পর্কে এর বেশী কিছু বলা যায় না। উপরে যে তিনটি আধুনিক সিদ্ধান্ত উল্লেখ করা হয়েছে, তার মধ্যে তৃতীয় বা সর্বশেষটিকেই এখন পর্যন্ত সর্বাধিক যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয়, যদিও এর অনেকখানিই কেবলমাত্র অধুনান্য উপর প্রতিষ্ঠিত বলে এ-এই বিষয়ে শেষ কথা বলে স্বীকার করা চলে না।

প্রবন্ধের আরম্ভে যে সকল প্রদেয় পণ্ডিতের মতামত উদ্ধৃত করা হয়েছিল, উপসংহাতে তাঁদের সিদ্ধান্তগুলি নিয়ে চূড়ান্ত একটি কথা বলা যেতে পারে। প্রথমেই দেখা যাবে যে, রেবন্তের পূজা বা ঐতিহ্যসম্পর্কিত বিবরণ কেবলমাত্র কতগুলি অর্ধাচীন পুরাণের মধ্যে আবদ্ধ নয়। মার্কণ্ডেয় পুরাণ (সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকে রচিত) বা বরাহমিহিরের বৃহৎ-সংহিতাকে (স্থানান্তরিত রচনাকাল খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতক), ঠিক অর্ধাচীন আখ্যা দেওয়া চলে না। রেবন্ত মূলতঃ লৌকিক ধর্ম ও সংস্কৃতির দেবতা ও পরবর্তী কালে তাঁর পূজা স্বর্ষ্যপূজার অন্তর্বিশেষে পরিণত হয়েছে, এই মতও শেষ পর্যন্ত বিচারসহ কি না, সে বিষয়েও সন্দেহ আছে। অন্তর্গত প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে আমি দেখিয়েছি যে, ভারতীয় স্বর্ষ্যপূজার ইতিহাসে প্রধানতঃ তিনটি ধারা লক্ষ্য করা যায়, যথা—(১) লৌকিক (মূলতঃ আর্ঘ্যভর গোষ্ঠীগুলির মধ্যে প্রচলিত) ধারা; (২) বৈদিক ও (৩) বিদেশাগত ইরানীয় বা পারসীক।^{৪০} রেবন্ত সম্পর্কে শিল্পগত এবং আরও খুঁটিনাটি দুই একটি প্রমাণ আলোচনা করে আমার ধারণা হয়েছে যে, ভারতীয় স্বর্ষ্যপূজার বিদেশী ইরানীয় অধ্যায়ের সঙ্গেই রেবন্তের যোগসূত্র সর্বাধিক ঘনিষ্ঠ এবং এই ধারা থেকেই রেবন্তপরিকল্পনার উৎপত্তি। সাধারণতঃ রেবন্তের যে মূর্তিগুলি পাওয়া গিয়েছে এবং শাস্ত্রে রেবন্তমূর্তির যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে কয়েকটি বিশেষত্ব সহজেই চোখে পড়ে। শাস্ত্রোক্ত বর্ণনার রেবন্তকে অস্বাক্ষর, কবচমণ্ডিত, ঋতু চর্ম ধনুক তুণ প্রভৃতি অস্ত্রে সুসজ্জিত বলা হয়েছে। আবিষ্কৃত রেবন্তমূর্তিগুলিও প্রত্যেকটি অস্বাক্ষর এবং তাদের পদদ্বয় আঙাছু-পাছুকা (top-boot) ধারা আচ্ছাদিত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রেবন্তমূর্তির সঙ্গে ছত্রধারী ও সশস্ত্র অশ্বচরসমূহের মূর্তিও উৎকীর্ণ দেখা যায়। শাস্ত্র-বর্ণনা ও প্রাপ্ত মূর্তির লক্ষণ একত্র করলে রেবন্তের পোষাক-পরিচ্ছদ যা ঠাঁড়ায়, প্রাচীন ভারতের মূর্তিতত্ত্বের আচার্যেরা তার নাম দিয়েছেন উদীচ্যবেশ বা উত্তরাঞ্চলবাসীর পোষাক। বরাহমিহির স্বর্ষ্যমূর্তি নির্মাণ প্রসঙ্গে স্বর্ষ্যকে উদীচ্যবেশে ভূষিত করার নির্দেশ দিয়েছেন^{৪১}—

মাসাললাটজ্জল্লোপগণ্ডবক্ষাংসি চোমতানি রবেঃ ।

স্বর্ষ্যাদীচ্যবেশং পূচং পাদাঙ্কুরো যাবৎ ॥

ষষ্ঠীয় পংক্তিতে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, স্বর্ষ্যমূর্তিকে উদীচ্যবেশে সজ্জিত করতে হবে

৪০। 'ভারতের সৌরধর্ম' ভারত-সংস্কৃতি (ডাঃ মহেন্দ্রনাথ সরকার-অধ্যক্ষীয় গ্রন্থ), পৃ: ২২২-২৩।

৪১। বৃহৎসংহিতা, ৫৮।৪০ (কার্ণ-সম্পাদিত সং, পৃ: ৫২০)।

।বং তাঁর পদদ্বয় হতে বক্ষদেশ পর্যন্ত আবৃত থাকবে। এখানে প্রচ্ছন্নভাবে উত্তরভারতে
 —চলিত সূর্য্যমূর্ত্তির পদদ্বয় আজ্ঞাছু-পাছুকা (top-boot) দ্বারা আবৃত করবার ও বক্ষোদেশ
 বচ দ্বারা আচ্ছাদিত করবার অভ্যাসের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। উত্তরভারতে এই
 প্রকার উদীচ্যবেশে সজ্জিত সূর্য্যমূর্ত্তি নির্মাণ করবার প্রথা প্রবর্ত্তন করেন পারস্ত থেকে
 ।দেশে আগত ম্যাজাই (Magi) সৌর-পুরোহিতগণ। ভারতীয় ঐতিহ্যে এঁরা মগ বা
 —মাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত। এঁদের প্রভাবে উত্তরভারতে নির্মিত সূর্য্যমূর্ত্তিতে
 প্রধানতঃ তিনটি বহিবাগত বিশেষত্ব দেখা দিয়েছিল, যথা—(১) সূর্য্যমূর্ত্তির বক্ষঃস্থল
 বচাবৃত করা; (২) সূর্য্যমূর্ত্তির আজ্ঞা পর্যন্ত পাছুকা (বা top-boot) দ্বারা আচ্ছাদিত
 করা; (৩) সূর্য্যমূর্ত্তির কটিদেশে ‘অভ্যঙ্গ’ (পারসীক ‘আইওয়ানঙ্গ’) নামক মূলতঃ পারসীক
 ধর্ম্মভূষ্ঠানে ব্যবহৃত কোমরবন্ধ পরিবেষ্টিত করা। খ্রীষ্টীয় প্রথম বা দ্বিতীয় শতক থেকে
 শুরু করে মধ্যযুগের আরম্ভ পর্যন্ত এই জাতীয় বৃট্জুতা-পরিহিত অভ্যঙ্গধারী ও কবচমণ্ডিত
 সূর্য্যমূর্ত্তির উত্তরভারতে খুবই বেশী প্রচলন ছিল। আধুনিক আবিষ্কার তা উত্তমরূপে প্রমাণ
 করেছে। দক্ষিণভারতে মগ-ব্রাহ্মণগণের প্রভাব সত্ত্বেও খুব বেশী ব্যাপ্ত হয়নি বলেই
 প্রাচীন দক্ষিণ-ভারতীয় সূর্য্যমূর্ত্তিতে সাধারণতঃ এই সকল বিশেষত্ব দেখা যায় না।
 বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতা ছাড়াও উত্তরভারতীয় কোনও কোনও প্রাচীন গ্রন্থে সূর্য্য-
 মূর্ত্তিকে উদীচ্যবেশে সজ্জিত করবার প্রথার প্রতি ইঙ্গিত আছে। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে এ বিষয়ে
 বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায়।^{৪৮} কিছু পরবর্ত্তী কালে দেখা যায় যে, উত্তরভারতীয় সূর্য্যমূর্ত্তির
 এই বৈশিষ্ট্যগুলি শিল্পীরা যদিও রক্ষা করে চলেছেন, তবুও আগেকার মত সুস্পষ্টভাবে নয়।
 প্রকাশ্যে সূর্য্যমূর্ত্তির পায়ে পাছুকা না পরিয়ে তাঁরা সূর্য্যমূর্ত্তির পা দুখানিকে পায়ের যুগে
 অধিকাংশ সময়ে প্রায় অখোদিত অবস্থায় রেখে দিতেন বা অনেক সময়ে পাদপীঠের সঙ্গে
 মিশিয়ে দিতেন। সূর্য্যমূর্ত্তির পদদ্বয় প্রকাশ্যে উৎকীর্ণ করতে পরবর্ত্তী শিল্পিগণের অনিচ্ছা,
 পূর্ববর্ত্তী কালে প্রচলিত সূর্য্যমূর্ত্তিকে আজ্ঞাছু পাছুকাবৃত করবার প্রথারই রূপান্তর মাত্র।
 পরবর্ত্তী কালে রচিত গ্রন্থাদিতেও এই শিল্পদৃষ্টি পরিবর্ত্তনের পরিচয় আছে। বরাহমিহির
 যে রকম সুস্পষ্ট ভাষায় সূর্য্যমূর্ত্তির পদদ্বয় আবৃত করবার নির্দেশ দিয়েছিলেন, উত্তরকালের
 আচার্য্যেরা তেমন কিছুই বলেননি। তাঁরা শিল্পিগণকে সূর্য্যমূর্ত্তির পদদ্বয় খোদাই করতেই
 নিষেধ করেছেন। মৎস্য ও পদ্মপুরাণদ্বয়ে স্পষ্টই বলা হয়েছে যে, সূর্য্যের পদদ্বয় তাঁর
 তেজোরশ্মির দ্বারাই আবৃত থাকবে, এবং যে শিল্পী তা খোদাই করতে সাহস করবেন, তিনি
 তৎক্ষণাৎ কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হবেন—^{৪৯}

যঃ করোতি স পাপিষ্ঠাং গতিমাপ্নোতি নিশ্চিতাম্।

কুষ্ঠরোগমবাপ্নোতি লোকেহস্মিন্ হৃৎকলংকৃতঃ।

৪৮। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর, ৩৬৭।১-১৭।

৪৯। মৎস্যপুরাণ, ১১।৩২ (জীবানন্দ বিজ্ঞানসংগ্রহে সং, পৃঃ ৬২); পদ্মপুরাণ, সৃষ্টিখণ্ড। ৮৪২ (বলবাসী
 সং, পৃঃ ৬২)।

পরবর্তী কালে ভারতীয় শিল্পীগণ স্পষ্টভাবে বিদেশী ঐতিহ্যকে স্বীকার ও অনুসরণ করে সম্ভবতঃ দ্বিধা করতেন বলেই, এই প্রচুর পন্থা অবলম্বন করেছিলেন। এ ছাড়াও স্বর্ধ্যমূর্তি পদময় পাছুকাবৃত্ত করবার বিদেশী প্রথাও ঐতিহ্যে ইঙ্গিত প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে অল্পদেখা যায়। মহাভারতের অশ্বশাসনপর্বের জমদগ্নি ও তাঁর পত্নী রেণুকার উপাখ্যানএসময় দেখা যায় যে, প্রথমে স্বর্ধ্যকিরণে রেণুকা অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়লে জমদগ্নি শরনিক্ষেপে স্বর্ধ্যকে ধ্বংস করতে উত্তম হন। স্বর্ধ্য তাঁকে প্রসন্ন করবার জন্ত রেণুকাকে স্বর্ধ্যতাপ নিবারণার্থে একটি ছত্র ও একঝোড়া চর্মপাছুকা প্রদান করেন। সেই হতে পৃথিবীতে ছত্র ও চর্মপাছুকার প্রচলন হয়।^{১০} বরাহপুরাণে রাজা মিথি ও তাঁর পত্নী রূপবতী সম্পর্কে যে উপাখ্যান পাওয়া যায়, তাতেও প্রায় একই কথা বলা হয়েছে। এ ক্ষেত্রেও রূপবতী স্বর্ধ্যতেজে অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়ায় স্বর্ধ্য রাজদম্পতীকে তুষ্ট করবার জন্ত তাঁদের ছত্র ও পাছুকা দান করেছিলেন।^{১১} এই দুটি উপাখ্যানেরই মূল বক্তব্য এক; দুটিতেই স্বর্ধ্যকে পৃথিবীতে ছত্র ও পাছুকার প্রবর্তকরূপে চিত্রিত করা হয়েছে। উত্তরভারতীয় স্বর্ধ্যমূর্তির পূর্বোন্নিখিত বিশেষত্বের কথা মনে রাখলে এবং বরাহমিহির ও পরবর্তী লেখকগণ-কথিত স্বর্ধ্যের উদীচ্যবেশের ঐতিহ্যের সঙ্গে মিলিয়ে কাহিনী দুটি পাঠ করলে এ বিষয়ে কোনও সন্দেহই থাকে না যে, দুই ক্ষেত্রেই স্বর্ধ্যকর্তৃক পৃথিবীতে পাছুকা পরিধান প্রবর্তন করবার বিবরণের মধ্যে উত্তরভারতে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক স্বর্ধ্যমূর্তিকে পাছুকা-শোভিত করবার প্রথা আনয়ন ব্যাপারের স্পষ্ট ইঙ্গিত বর্তমান। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা চলে যে, স্বল্পপুরাণের ব্রহ্মধণ্ডে স্বর্ধ্যপূজা উপলক্ষ্যে অপরাপর বস্তুর মধ্যে ছত্র এবং পাছুকা দানের বিধান দেওয়া হয়েছে।^{১২}—

ধেহুং তিলময়ীং ব্রহ্মাধমিন্ ক্লেদে চ ভারত ।

উপানবো চ ছত্রঃ সীতজ্ঞাধিকং তথা ॥

বর্তমান আলোচনার ধারার সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে এই উক্তির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। লক্ষ্য করবার বিষয় যে, ইরানীয় কারদার পাছুকা সর্বদা কেবলমাত্র স্বর্ধ্যমূর্তিকেই যে পরানো হত, তা নয়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় স্বর্ধ্যমূর্তির উত্তম পার্শ্বস্থ অল্পচর এবং অল্পচরীগণও মোটাটোটি উদীচ্যবেশে সজ্জিত হতেন এবং তাঁদের চরণও পাছুকাবৃত্ত করা হত। সুতরাং উত্তরভারতের সৌরভাস্কর্যে পারগীক প্রভাব যে দূরপ্রসারী হয়েছিল, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কবচমণ্ডিত ও সশস্ত্র বেরস্তের বর্ণনা পাঠ করলে ও আজ্ঞাছু বুটপরিহিত রেবস্তের আবিষ্কৃত মূর্তিগুলি মনে ধিয়ে লক্ষ্য করলে বুঝতে বাকী থাকে না যে, স্বর্ধ্যপূজা ও সৌরভাস্কর্যের ক্ষেত্রে যে বিদেশী ইরানীয় ঐতিহ্যের প্রভাব উত্তরভারতে এত স্থায়ী ও গভীর হয়েছিল, রেবস্তের পরিকল্পনাতে ও মূর্তিগঠনে সেই একই প্রভাব কার্যকরী

১০। মহাভারত, ১৩।১৫।১-২৮, ১৩।১৬।১-২২।

১১। বরাহপুরাণ, ২০।১২৫-২০ (বিশিষ্টিকা-সং, পৃ: ১১৮৬-২০)।

১২। স্বল্পপুরাণ, ব্রহ্মধণ্ড, ১২।১০।১৫ (বদ্বাসী সং, তৃতীয় ভাগ, পৃ: ১৮১২)।

হয়েছে। এই উপলক্ষ্যে মহাভারতে সূর্য্যপুত্র কর্ণের যে জন্মবিবরণ আছে, তা বিশেষভাবে অরণীয়। সর্বপ্রথম এর প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন অধ্যাপক ডাঃ জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।^{৫০} রেবন্ত যেমন অখারুট, শশজ ও কবচাবৃত হয়ে মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হন, তেমনি কর্ণও কবচমণ্ডিত ও কুণ্ডলশোভিত অবস্থায় মাতা কুন্তীর গর্ভ হতে প্রসূত হয়েছিলেন^{৫১}—

আয়ুজ্জকবচঃ শ্রীমান্ দেবগর্ভঃ শ্রিরাসিতঃ।

সহস্রং কবচং বিভ্রং কুণ্ডলোচ্ছ্যোতিতাননঃ॥

অজায়ত সূতঃ কর্ণঃ সর্বলোকেষু বিভ্রতঃ॥

রেবন্তের মত কবচমণ্ডিত কর্ণের জন্মকালীন বর্ণনায় সূর্য্যমুর্ত্তিকে কবচমণ্ডিত করবাব পারসীক ধারা প্রভাব বিস্তার করেছে, এতে কোনও সন্দেহ নেই। সূর্য্যের দুই পুত্রের উপরেই এই প্রভাব সঞ্চারিত হতে আমরা দেখতে পাচ্ছি। সূত্রাং সমস্ত সাক্ষ্য একত্র করে নিরপেক্ষভাবে বিচার কবে দেখলে মনে হয়, এখন পর্য্যন্ত আমরা যেটুকু জানতে পেরেছি, তার ভিত্তিতে রেবন্তকে ভারতীয় সূর্য্যপুত্রা ও সৌরধর্মের বিদেশী ইরানীয় ধারার সঙ্গে যুক্ত করাই সম্ভব। এই প্রসঙ্গে অরণে রাখা যেতে পারে যে, শিবপুরাণে রেবন্তকে ‘ভিষগবর’ বা চিকিৎসক আখ্যা দেওয়া হয়েছে। মার্কণ্ডেয় ও স্বন্দপুরাণদ্বয়ে রেবন্তের মাহাত্ম্য ব্যাখ্যান উপলক্ষ্যে বলা হয়েছে, রেবন্ত তাঁর ভক্তবৃন্দকে আরোগ্য দান করে থাকেন। এর মধ্যে অন্তত মার্কণ্ডেয় পুরাণের উক্তি যে খুবই প্রাচীন, আলোচনা প্রসঙ্গে পূর্বেই তা বলেছি। বিদেশী মগ পুরোহিতগণের প্রভাবে খ্রীষ্টীয় তৃতীয় বা চতুর্থ শতক থেকে সূর্য্যকে রোগ-চিকিৎসক হিসাবে বিশেষভাবে উপাসনা করবার রীতি উত্তরভারতে সর্বত্র প্রচলিত হয়েছিল। এ বিষয়ে প্রচুর প্রমাণ প্রাচীন সাহিত্য ও খোদিত লিপি ইত্যাদিতে পাওয়া যায়।^{৫২} অন্ততঃ মার্কণ্ডেয়পুরাণের (খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতক?) নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্যে দেখা যায় যে, এই বৈশিষ্ট্য বেবন্তের উপরও আরোপিত হত। স্বন্দপুরাণ ও শিবপুরাণের উক্তি মার্কণ্ডেয় পুরাণকে সমর্থন করে। সূর্য্যের সঙ্গে রেবন্তের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের পটভূমিকায়, এই পৌরাণিক সাক্ষ্যসমূহ আলোচনা করলেও স্বভাবতঃ এ অসুমান মনে আসে যে, পারসীক-প্রভাবান্বিত উত্তরভারতের সূর্য্যপূজা ও রেবন্তপূজা সমগোত্রীয়। এই প্রসঙ্গে আরও মনে রাখা দরকার যে, স্বন্দপুরাণের আবস্ত্যধণ্ডে অবস্থীকে (পূর্ব ও পশ্চিম মালোয়া) এবং প্রতাসধণ্ডে প্রতাসক্ষেত্রকে (কাপিওয়াড়) রেবন্তপূজার কেন্দ্র বলে প্রচ্ছন্নভাবে ইঙ্গিত

৫০। ‘Surya’ নামক তাঁর অপ্রকাশিত গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। এর পাণ্ডুলিপি তিনি আমায় ব্যবহার করতে দেওয়ায় আমি তাঁর নিকট কৃতজ্ঞ। গ্রন্থটি শীঘ্রই প্রকাশিত হবে।

৫১। মহাভারত, ১।১১১।১৮-১৯।

৫২। ‘সাহিত্য-গরিষ্য-পত্রিকা’ ৫৭শ বর্ষ, ১ম-২য় সংখ্যা (পৃঃ ২৫-৪৩) প্রকাশিত বর্তমান লেখকের ‘ভারতীয় সূর্য্যপূজার একটি বৈশিষ্ট্য’ গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। সেখানে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে।

করা হয়েছে। প্রভাসখণ্ডের দুই স্থানে প্রভাসে প্রতিষ্ঠিত রেবন্তমূর্ত্তির স্পষ্ট উল্লেখ ও তার মাহাত্ম্যবর্ণনা স্থান পেয়েছে।^{৬৬} মার্কণ্ডেয় পুরাণের মত এত প্রাচীন গ্রন্থ না হলেও, স্বন্দপুরাণ এ বিষয়ে যে উক্তি করেছে, তা নির্ভরের একেবারে অযোগ্য নয়। দেখা যাচ্ছে, এই পুরাণ উত্তরভারতের সুদূর পশ্চিমাঞ্চলের সঙ্গে অর্থাৎ কাথিওয়াদ গুজরাট মালোয়া প্রভৃতি অঞ্চলের সঙ্গে প্রধানতঃ রেবন্তপূজাকে যুক্ত করেছে। মগ ব্রাহ্মণগণ ইরাণ থেকে এ দেশে আগমন করবার সময়ে সর্বপ্রথম ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিম ও পশ্চিম সীমান্তেই পদার্পণ করেন এবং স্বভাবতঃ এই সকল অঞ্চলই প্রথম তাঁদের কর্তৃত্বক্ষেত্ররূপে প্রসিদ্ধি লাভ করে। ভবিষ্যপুরাণোক্ত উপাখ্যান অনুযায়ী শ্রীকৃষ্ণপুত্র শাষ সর্বপ্রথম তাঁদের ভাবতবর্ষে আনয়ন করেন এবং সিন্ধুপ্রদেশের মূলতানে (প্রাচীন মূলহানপুর) সূর্য্যমন্দির নির্মাণ করে সেখানে তাঁদের সৌরপুরোহিত নিযুক্ত করেন।^{৬৭} ক্রমে তাঁদের প্রভাব উত্তরভারতের অন্তর্যন্ত প্রসারিত হয়। উত্তরভারতের পশ্চিমাঞ্চল তাঁদের আদি কর্তৃত্বভূমি বলে এই অঞ্চলে তাঁদের প্রভাব বরাবর খুবই বেশী ও শক্তিশালী ছিল। এঁদের প্রভাব ক্রমপ্রসারিত হওয়ার ফলে বিভিন্ন স্থানে নূতন সূর্য্যমন্দির প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে এবং সূর্য্যপূজার নব নব কেন্দ্রসমূহ স্থাপিত হতে থাকে। সৌরবর্ষের এই নূতন কেন্দ্রসকল স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে পৌরাণিক সাহিত্যে শাষোপাখ্যানের বিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। যখনই একটি নূতন কোনও স্থানে সূর্য্যমন্দির নির্মিত হত, তখন প্রায় সর্বদা শাষোপাখ্যানকে স্থানকালের উপযোগী নূতন রূপ দেওয়া হত এবং দেখাবার চেষ্টা করা হত যে, শাষ সর্বপ্রথম ঐ স্থানেই সূর্য্যমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করে পূজা করেন এবং ঐ স্থানের সূর্য্যমন্দিরটিই শাষপ্রতিষ্ঠিত আদি সূর্য্যমন্দির। এই ভাবে বিভিন্ন সময়ে পৌরাণিক সাহিত্যে মথুরা কাশী উড়িষ্যা প্রদেশস্থ কোণার্ক প্রভৃতি স্থানের সঙ্গে শাষোপাখ্যানকে যুক্ত করবার প্রচেষ্টা দেখা যায়। স্বন্দপুরাণের প্রভাসখণ্ডে প্রভাসক্ষেত্রের সঙ্গে শাষোপাখ্যানকে সুস্পষ্টভাবে জড়িত করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, মিত্রবন, যুগ্মীর এবং প্রভাসক্ষেত্র, এই তিনটি স্থানে শাষকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সূর্য্য অবস্থান করছেন এবং প্রভাসক্ষেত্রস্থ শাষপুর সূর্য্যের দ্বিতীয় শাখত বাসস্থান। শাষ যে এখানে সূর্য্যমূর্ত্তি স্থাপন করেছিলেন, এ কথাও প্রভাসখণ্ডে স্পষ্ট বলা হয়েছে।^{৬৮}—

সাহাধিত্যং সুরক্ষেত্রে যঃ সাধেন প্রতিষ্ঠিতঃ ।

স্থানানি ত্রীণি দেবন্ত দ্বীপেহস্মিন্ ভাস্করত তু ।

৬৬। স্বন্দপুরাণ, আবৃত্ত্য খণ্ড ১২।৫৬।২৩-২৬ মহাকালবনে রেবন্তের অধিষ্ঠান ও রেবন্তেশ্বর লিঙ্গ প্রতিষ্ঠার বিবরণ সম্পর্কে দ্রষ্টব্য। ঐ পুরাণ, প্রভাস খণ্ড ১।১১।২১০ এবং প্রভাস খণ্ড ১।১৩০।১-২, প্রভাস ক্ষেত্রে অবস্থিত বেবন্তমূর্ত্তি সম্পর্কে দ্রষ্টব্য। (বঙ্গবাসী সং, পঞ্চম ভাগ, পৃঃ ৩০৭৩, সপ্তম ভাগ, পৃঃ ৪৫২২, ৪৬০২ দ্রষ্টব্য)।

৬৭। ভবিষ্যপুরাণ, ব্রাহ্ম পর্ব, অধ্যায় ১২৭ থেকে ১৪৯ (বেঙ্কটেশ্বর প্রেস সং, পৃঃ ১১৩-৩৩)।

৬৮। স্বন্দপুরাণ, প্রভাস খণ্ড ১।১০০।১২-৪; প্রভাস খণ্ড ১।১০১।৪৫-৪৬ (বঙ্গবাসী সং, সপ্তম ভাগ, পৃঃ ৪৭৫৭, ৪৭৬০)।

পূর্বং মিহ্রবনং নাম তথা মূর্তীরমুচ্যতে ।
 প্রভাসক্ষেত্রমাছায় সাধাদিত্যতৃতীয়কঃ ॥
 তস্মিন্ ক্ষেত্রে মহাদেবি পুরং যৎ সাধসংজ্ঞকম্ ।
 দ্বিতীয়ং শাস্ত্রতঃ স্থানং তত্র হৃদ্যস্ত নিত্যশঃ ॥

— — — — —
 প্রভাসক্ষেত্রমগমং সর্বপাতকনাশনম্ ।
 এবং তৎক্ষেত্রমাসাচ্চ তপশ্চেন্দ্রে সুদারুণম্ ॥
 প্রতিষ্ঠাপ্য সহস্রাংশুং দেবং পাপনিহননম্ ।
 ততশ্চামাধম্যাস পরং নিয়মমাস্ত্রিতঃ ॥

যদিও এই গ্রন্থে মগ-ব্রাহ্মণগণের উল্লেখ নেই, তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। মগ-ব্রাহ্মণগণের প্রচারিত সূর্য্যোপাসনার নূতন অধ্যায় ভারতবর্ষে সুপ্রতিষ্ঠিত ও সর্বস্বীকৃত হয়ে যাবার পরে এই ব্যাপারে উক্ত বিদেশী সৌরপুরোহিতবর্গের ঐতিহাসিক ভূমিকা ও কৃতিত্ব অস্বীকার করবার একটা প্রচেষ্টা স্বভাবতঃই গোড়া ভারতীয় ব্রাহ্মণসমাজে দেখা দিয়েছিল। ফলে শাছোপাখ্যানের অধিকাংশ পরবর্তী বিবরণে মগ পুরোহিতগণের উল্লেখ নেই। কিন্তু তার জন্ত আমাদের বক্তব্য প্রমাণে কিছু অস্বীকার হয় না। প্রভাসক্ষেত্র যে পারসীক প্রভাবাধিত সৌর ধর্মের একটি বড় কেন্দ্র ছিল, পুরাণকার কর্তৃক শাছোপাখ্যানকে এর সঙ্গে যুক্ত করবার প্রয়াসই তার অস্বতন্ত্র প্রমাণ। গুজরাট ও কাশিওয়াড় অঞ্চলে আবিস্কৃত বহু সূর্য্যমূর্ত্তি (উদীচ্যবেশে সজ্জিত) এবং সূর্য্যমন্দিরের ধ্বংসাবশেষও এই অঞ্চলে মগব্রাহ্মণগণ-প্রবর্তিত সূর্য্যপূজার ব্যাপক অতীত প্রভাবের পরিচয় দেয়।^{৫৯} স্মরণ্য প্রভাসক্ষেত্র ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সঙ্গে রেবন্তপূজার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের বিবরণ যে অনেক পরিমাণে মগপুরোহিতগণ কর্তৃক ভারতে আনীত সূর্য্যপূজার ইরানীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে রেবন্তপূজার অন্তরঙ্গ সম্পর্কের ইঙ্গিত করে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কাশিওয়াড় অঞ্চলে রেবন্তপূজা সুপ্রচলিত থাকার প্রমাণ আরও পাওয়া যায় জুনাগড়ের অন্তর্গত বন্থলি নামক মহলে প্রাপ্ত ১১৯০ খৃষ্টাব্দের একখানি খোদিত লিপিতে। এই লিপি অল্পসারে বুদ্ধে নিহত হরিপাল নামক জনৈক ব্যক্তির লাতা হরিপালের মূর্ত্তিযুক্ত একটি রণস্তম্ভ এবং সূর্য্যপুত্র রেবন্তের মূর্ত্তির সম্মুখে একটি মণ্ডপ নিৰ্ম্মাণ করেছিলেন (“সহস্রদ্বারস্তম্ভ-জন্মনঃ শ্রীরেবন্তনামঃ পুরভো নবীনম্ অটীকরম্মণ্ডপমধ্বিতীয়মহো মহাসাধনিকঃ স এব”)। লিপিখানির আরম্ভেও রেবন্তকে প্রণাম জানানো হয়েছে (“ও শ্রীরেবন্তায় নমঃ”)।^{৬০} পূর্ব্বালোচিত সাক্ষ্যসমূহের সহিত মিলিয়ে গ্রহণ করলে এই খোদিত লিপিখানির সাক্ষ্য রেবন্তের গোত্রনির্ণয় সম্পর্কে আমাদের অসুমানকে বলবন্তর করে।

৫৯। H. D. Sankalia : The Archaeology of Gujrat (including Kathiwar), pp. 157-64, 212-14.

৬০। Poona Orientalist, vol. III, p. 28 ; Bhandarkar's List of Inscriptions, No. 624 (Epigraphia Indica, vol. XX, p. 89)

রেবন্ত মূলতঃ পশুজীবী শিকারী কোমের লোকায়ত দেবতা ছিলেন, লোকায়ত জীবনের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, এবং পরবর্তী কালে ব্রাহ্মণ্যধর্ম তাঁকে স্বীকার করে নেয় ও অস্বাক্ষর বলে স্বর্ঘ্যের সহিত আত্মীয়তা তার উপর আরোপ করে, এই সকল যুক্তি কতখানি বিচারসহ, তা ভেবে দেখবার বিষয়। ভারতীয় লৌকিক সংস্কৃতির এমন কোনও দেবতার কথা এখন পর্য্যন্ত আমরা জানি না, যার সঙ্গে রেবন্তের উল্লেখযোগ্য সাদৃশ্য আছে এবং যাকে সেই কারণে রেবন্তপরিকল্পনার উৎপত্তিস্থল বলা যেতে পারে। ষাটনগরে রেবন্তের যে মূর্তিটি আবিস্কৃত হয়েছে (এর বর্ণনা বর্তমান প্রবন্ধে ভাষ্যার্থ্যসঙ্গে দ্রষ্টব্য), তার সঙ্গে অবশ্য আক্রমণোত্তত দস্যু, মৎস্যকর্তনে নিযুক্ত জীলোক, গৃহান্তান্তরে অবস্থিত মনুষ্যদম্পতী প্রভৃতি কয়েকটি ঋণী লৌকিক জীবনের চিত্র যুক্ত দেখা যায়। কিন্তু রেবন্ত যে মূলতঃ লৌকিক ধর্ম ও সংস্কৃতির দেবতা, ঐ একটি ভাষ্যার্থ্য কি তা নিঃসংশয়ে প্রমাণ করবার পক্ষে যথেষ্ট? ষাটনগর-মূর্তির অল্পরূপ রেবন্তমূর্তি, বত দূর জানা যায়, আর পাওয়া যায়নি। সাহচর্য মৃগয়াবিহারী রেবন্তের মূর্তিই আমরা এ পর্য্যন্ত বেশী পেয়েছি। মার্কণ্ডেয় ও স্বন্দপুরাণদ্বয়ে রেবন্তকে যে দস্যু প্রভৃতির হাত থেকে জ্ঞানকর্তা বলে বর্ণনা করা হয়েছে, তার ভিত্তিতে অবশ্য ষাটনগর-মূর্তিটিকে ভাল ভাবেই ব্যাখ্যা করা যায়। তবুও স্বীকার করতে হয় যে, লৌকিক জীবনযাত্রার এত সজীব চিত্র মধ্যযুগীয় ভাষ্যার্থ্য বিরল। কিন্তু এ ক্ষেত্রে এমন অল্পমানও করা যেতে পারে যে, লৌকিক জীবনযাত্রার সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয়সম্পন্ন সংস্কারযুক্ত কোনও শিল্পী এই মূর্তি গড়েছিলেন এবং তাঁর নিজস্ব ভঙ্গীতে তিনি পৌরাণিক বর্ণনাকে পাশাণে রূপ দিয়েছেন। এও অসম্ভব নয় যে, এই বিশেষ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে স্থানীয় কতগুলি লোকাচার রেবন্তপূজার সঙ্গে জড়িত করা হয়েছিল বলেই মূর্তিটি ঐ রূপ নিয়েছে। মনে রাখতে হবে যে, আলোচ্য ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় রেবন্তের মূর্তিতে বড় একটা বিশেষত্ব নেই। রেবন্তকে অস্ত্রাঙ্ক স্থানে প্রাপ্ত মূর্তির মত এখানেও অস্বাক্ষর, আক্রমণ-পাছুকাবৃত ও অল্পচরিত্র হস্তধারা সুরক্ষিতমস্তকরূপেই উৎকীর্ণ করা হয়েছে। রেবন্তের চতুর্পাৰ্শ্ব মূর্তিগুলির সংস্থান ও পরিকল্পনার মধ্যেই বা কিছু বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। এ বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ স্থানীয় হওয়াও সম্ভব। মোটকথা, রেবন্তের এই জাতীয় মূর্তি যখন এ পর্য্যন্ত একটিই পাওয়া গিয়েছে, তখন এর বৈশিষ্ট্যগুলিকে সাধারণ ভাবে রেবন্ত-পূজার বৈশিষ্ট্য মনে না করে শিল্পীর নিজস্ব বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় বা সম্পূর্ণ স্থানীয় কোনও প্রভাবের ফল বলে ধরে নেওয়াই বোধ করি যুক্তিসঙ্গত এবং নিরাপদ, বিশেষতঃ যখন রেবন্তের অল্পজাতীয় মূর্তি অপেক্ষাকৃত অধিকসংখ্যায় পাওয়া গিয়েছে এবং রেবন্তকে বিদেশী সৌর ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত করবার পক্ষে প্রচুর যুক্তি রয়েছে।

রেবন্ত আদৌ পশুজীবী কোনও শিকারী গোষ্ঠীর লোকায়ত দেবতা, এই জাতীয় অল্পমানের মূলে বোধ করি, অল্পচরপরিবেষ্টিত মৃগয়ারত রেবন্তের আবিস্কৃত মূর্তিগুলি বর্তমান। কিন্তু খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে বরাহমিহির তাঁর বৃহৎসংহিতায় রেবন্তমূর্তি গঠন করবার যে সংক্ষিপ্ত নির্দেশ দিয়েছিলেন (পূর্বেই তা উদ্ধৃত করেছি), এই জাতীয় মূর্তিগুলি সম্পূর্ণভাবে যে সেই

বর্ণনা অল্পসারে উৎকীর্ণ, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। গঠনপ্রণালীর মধ্যেও পারসীক সৌর ঐতিহ্যের প্রভাব অস্পষ্ট এবং রেবন্ত এ সকল ক্ষেত্রে অনেকাংশে 'উদীচ্যবেশ' সজ্জিত। লক্ষ্য করবার বিষয়, রেবন্তমূর্ত্তি নির্মাণে মার্কণ্ডেয় বা স্বনপুরাণঘরের ঐতিহ্যের অপেক্ষা বরাহমিহিরের নির্দেশই অধিকতর ভাবে পালিত হয়ে এসেছে। ঘাটনগরে আবিস্কৃত রেবন্তমূর্ত্তিই বোধ করি, এর এ-পর্ধ্যন্ত স্মৃতি একমাত্র ব্যতিক্রম। সেখানেও যে কেন্দ্রীয় রেবন্তের মূর্ত্তির সঙ্গে বরাহমিহিরের বর্ণনামুযায়ী গঠিত অছাভ্য রেবন্তমূর্ত্তির বিশেষ কোনও পার্থক্য নেই, এ কথা পূর্বেই বলেছি। স্মৃত্যুৎসবের নেওয়া যেতে পারে, রেবন্তমূর্ত্তি নির্মাণে বরাহমিহিরের নির্দেশকেই উত্তরভারতে সর্বদা আদর্শ বলে মনে করা হত। বরাহমিহির অবশ্য রেবন্তের ক্ষেত্রে উদীচ্যবেশ বা কোনও খুঁটিনাটির উল্লেখ করেননি, কিন্তু তাঁর নির্দেশামুযায়ী নির্মিত রেবন্তমূর্ত্তিগুলিতে রেবন্তের উদীচ্যবেশ লক্ষ্য করে মনে হয় যে, তাঁর যুগে রেবন্তকে উদীচ্যবেশে সূক্ষ্মীভূত করবার প্রথাও প্রচলিত হয়ে গিয়েছিল। মার্কণ্ডেয় পুরাণে (খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতক) রেবন্তের যে বর্ণনা আছে, তাতেই উদীচ্যবেশের কতগুলি স্পষ্ট লক্ষণ দেখা যায়। সেখানে রেবন্তকে কবচমণ্ডিত, অশ্বারূঢ়, শশজ ইত্যাদি বলা হয়েছে। এ-রকমও হতে পারে যে, স্বর্ঘ্যের ক্ষেত্রে উদীচ্যবেশের বর্ণনা দেওয়ার পর স্বর্ধ্যপুত্র রেবন্তের অতি সংক্ষিপ্ত উল্লেখে বরাহমিহির তার পুনরুজ্জীবিত অনাশ্রিত মনে করেছিলেন। মনে রাখা উচিত যে, বরাহমিহির খুব সম্ভবতঃ অযং ছিলেন বহিরাগত মগব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়ভূক্ত।^{৩১} স্মৃত্যুৎসব তাঁর মাধ্যমে স্বর্ধ্যপুত্র রেবন্ত সম্পর্কে যে ঐতিহ্য রক্ষিত এবং প্রচারিত হয়েছে, তাতে পারসীক সৌর প্রভাব থাকা খুবই স্বাভাবিক। বিশেষতঃ যখন দেখা যাচ্ছে যে, তাঁর অন্ততঃ দুই শতাব্দী পূর্বেই মার্কণ্ডেয় পুরাণে রেবন্তের বর্ণনায় কিছু কিছু বিদেশী লক্ষণ অস্পষ্টভাবে স্বীকৃত; তখন তাঁর যুগে যে ঐ সকল বৈশিষ্ট্য আরও সুপরিচিত হবে, এ অল্পমান সহজেই করা যেতে পারে। স্মৃত্যুৎসব এ বিষয়ে আত্মপুঙ্খিক ভাবে আলোচনা করলে এবং বরাহমিহিরের বর্ণনা ও তদনুযায়ী নির্মিত রেবন্তমূর্ত্তিগুলির লক্ষণ মিলিয়ে দেখলে, বুঝতে বাকী থাকে না যে, এই মূর্ত্তিসমূহের পরিকল্পনা ও গঠনপ্রণালীর মধ্যে পারসীক সৌর ঐতিহ্য সক্রিয় হওয়াই স্বাভাবিক। যা কিছু ভাষ্য পাওয়া যায়, সবই এই আত্মমানিক সিদ্ধান্তের দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করে। অপর পক্ষে পশ্চিমী কখনও শিকারী গোষ্ঠীর কোনও লোকায়ত দেবতার পরিকল্পনা ও প্রভাব, রেবন্তপরিকল্পনা ও রেবন্তমূর্ত্তির উপরিউক্ত বিজ্ঞানের মূলে ছিল, এ বিষয়ে সম্পূর্ণ প্রমাণাভাব।

রেবন্ত মূলতঃ অশ্বারূঢ় বলে পরবর্তী কালে তাঁকে স্বর্ঘ্যের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়রূপে কল্পনা করা হয়েছে, এই অল্পমানও যুক্তিগ্রাহ্য বলে মনে হয় না। বরঞ্চ এ কথা বললে সত্য সম্ভবতঃ অধিক প্রকাশ পায় যে, স্বর্ঘ্যের সঙ্গে রেবন্তের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তাই অনেকটা তাঁর অশ্বারূঢ়-

৩১। এই বিষয়ে Indian Historical Quarterly (September 1949) পত্রিকায় বর্তমান লেখকের 'The Maga Ancestry of Varahamihira' প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

রূপে পরিকল্পিত হওয়ার কারণ। পৌরাণিক ঐতিহ্যে রেবন্ত কেবলমাত্র অশ্ববাহন তিনিনি অশ্বের অধিপতি, এবং অধিরক্ষক। অশ্বশালায় বিশেষ করে তাঁর পূজা করবার রীতি ছিল। রাজগণ অশ্ববৃদ্ধির মানসে তাঁকে পূজা করতেন। স্বন্দপুরাণের পূর্বোক্ত গা এ বিষয়ে অতি স্পষ্ট। রঘুনন্দনও কোজাগরী পূর্ণিমার রাতে লক্ষ্মীপূজার পূর্বে অধিকারী ব্যক্তিগণকে রেবন্ত-পূজার নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং অশ্বের সঙ্গে রেবন্ত সংশ্লিষ্ট যে অতি ঘনিষ্ঠ ছিল, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। অল্পসন্ধান করলে দেখা যায়, ভারতীয় ঐতিহ্যে এক স্বর্ঘ্য তিন অশ্বের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠ সংশ্লিষ্ট অস্ত্র কোনও দেবতাই নেই। বৈদিক স্বর্ঘ্যপূজায় স্বর্ঘ্যকে সপ্তাশ্ববাহিত রথে গগনপথে চলমানরূপে কল্পনা হয়েছে। প্রাচীন ইরাণীয় সৌর দেবতা মিথ্র, 'মিহির'রূপে যার পূজা মগপুরোহিত ভারতে প্রবর্তন করেন, প্রাচীন পারসীক ধর্মগ্রন্থ আবেস্তার অন্তর্গত 'মিহির যশ্' অল্পসারে, বিখ্যাত ভক্তবন্দকে দ্রুতগামী অশ্ব দান করে থাকেন।^{৩২} বৈদিক এবং প্রাচীন পারসীক স্বর্ঘ্যোপাসনার এই দুটি ধারাতেই সৌর দেবতার সঙ্গে অশ্বের সংশ্লিষ্ট স্বীকৃতি পরবর্তী কালে ভারতবর্ষে এই দুই ধারার মিলনের ফলে যে সৌর স্বর্ঘ্যের আবির্ভাব হয়, তাতে স্বভাবতঃই স্বর্ঘ্যের সঙ্গে অশ্বের ব্যাপক সংশ্লিষ্ট দেখা যায়। ভারতবর্ষের অধিকাংশ প্রাচীন স্বর্ঘ্যমূর্তির পায়ের কাছে স্বর্ঘ্যসারথি অরুণ ও স্বর্ঘ্যের রথে যোজিত সাতটি অশ্বের মূর্তি লক্ষ্য করবার বিষয়। এ বিষয়ে শিল্পশাস্ত্রে স্বর্ঘ্যমূর্তিনির্মাণ-পদ্ধতি আলোচনা প্রসঙ্গে নির্দেশ পাওয়া যায়। 'পূর্বকারণাগমে'র ত্রয়োদশ পটলে বলা হয়েছে^{৩৩}—

একচক্রসপ্তাশ্বসারথিমহাযশম্।

কৃষা তু হাশয়েৎ স্বর্ঘ্যং পুরুষাকৃতিস্থাপনম্ ॥

এই প্রসঙ্গে কোণার্কের সুবিখ্যাত স্বর্ঘ্যমন্দিরের উল্লেখ করা যেতে পারে। এই মন্দির সমগ্রভাবে একটি রথের আকারে পরিকল্পিত ও নির্মিত হয়েছিল এবং এর সমুদ্রে রাযোজিত অশ্বগুলির কোনও কোনওটির মূর্তির ভগ্নাংশ এখনও বিদ্যমান। তা ছাড়া এ মন্দির-প্রাঙ্গণের দক্ষিণে বালিপাথরে তৈয়ারি দুটি বিশাল ও অপূর্ণ সুসজ্জিত অশ্বের মূর্তি দেখা যায়। একাকী ও অস্বাকৃতি অবস্থায়ও যে, স্বর্ঘ্যের মূর্তি নির্মিত হত, এবং অগ্নিপুত্র যে সেই জাতীয় স্বর্ঘ্যমূর্তির বর্ণনা আছে, তার উল্লেখ পূর্বেই করেছি। এই প্রসঙ্গে পূর্বোক্ত পৌরাণিক সাহিত্যে বিখ্যাত স্বর্ঘ্য ও সংজ্ঞার উপাখ্যান অরণীয়। সেখানেও দেখা যায় যে সংজ্ঞা অশ্বিনীরূপ ধারণ করে উত্তরভূকৃতে বিচরণ করছিলেন এবং স্বর্ঘ্যও অশ্বরূপে সেখানে তাঁর সঙ্গে মিলিত হলেন। অশ্বিন ও রেবন্তের এই ভাবেই জন্ম। এই কাহিনীতে স্বর্ঘ্যের সহিত অশ্বের সংশ্লিষ্ট সম্পর্কে প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত আছে বলে মনে হয়। স্বর্ঘ্যের মাধ্যমে এই অশ্বসংশ্লিষ্ট স্বর্ঘ্যের পুত্র অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের উপরে পর্যন্ত আরোপিত হতে দেখা যায় ভারতীয় মূর্তিশিল্পে অশ্বিনীকুমারদ্বয় অশ্বমুখরূপে নির্মাণ করবার রীতি আছে। কোন

৩২। Haug : Essays on the Religion of the Parsis, p. 202.

৩৩। Gopinath Rao : Elements of Hindu Iconography, vol. 1, pt. II, Append C, p. 89.

প্রাচীন ভারতীয় (বিশেষতঃ উত্তরভারতীয়) সূর্য্যমূর্ত্তির উভয় পার্শ্বে দণ্ডায়মান বা সূর্য্যপুত্র অশ্বমুখ অশ্বিরয়ের মূর্ত্তিও দেখতে পাওয়া যায়।^{১০} সূর্য্যপুত্র উপলক্ষ্যে ত অশ্বদানের প্রথা এই বিষয়ে আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রমাণ। স্বন্দপুরাণের ও বলা হয়েছে, সূর্য্যপুত্র উপলক্ষ্যে অপরাপর বস্তুর মধ্যে অশ্ব দান বিধেয়।^{১১}

শেহুদানঞ্চ শয্যাক বিক্রমঞ্চ হয়ং তথা ।

দাসী-মহিষী-বটীক্চ তিলং কাঞ্চনসংযুতম্ ॥

এদের প্রভাসথণ্ডে চিত্রাদিত্য নামক একটি সূর্য্যমূর্ত্তির মাহাত্ম্যবর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, তাত্যক্ষেত্রে ব্রাহ্মণকে অশ্ব, কোষবন্ধ অসি ও স্বর্ণ দান করা কর্তব্য^{১২}—

তত্রৈব চান্ডো দাতব্যঃ সকোষং ধঙ্কমেব চ ।

হিরণ্যং চৈব বিপ্রায় এবং যাত্রাকলং লভেৎ ॥

বাড়িয়ে লাভ নেই। সমগ্রভাবে প্রমাণগুলি আলোচনা করিলে স্পষ্ট বোঝা যায়, এক যুগ থেকে ভারতীয় সূর্য্যপূজার সঙ্গে অশ্বের সংশ্লিষ্ট অতি ঘনিষ্ঠ। ইরান থেকে কালে সৌর ধর্মের যে ধারা ভারতবর্ষে এসেছিল, তাতেও দেখা যায়, মিথ্র বা রর সঙ্গে অশ্বের সংশ্লিষ্ট অস্বীকৃত নয়। পরবর্তী কালে বৈদিক ও ইরানীয় সূর্য্যপূজার এই ধারা ভারতবর্ষে (বিশেষতঃ উত্তরভারতে) মিশে যায়, এবং ফলে ভারতবর্ষীয় পাসনায় অশ্ব চিরকাল গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে এসেছে। সূর্য্যপুত্র অশ্বিনী-বয়ের পরিকল্পিত মূর্ত্তিতে আমরা তার নিদর্শন দেখতে পাই। সুতরাং এ সিদ্ধান্ত ই করা চলে যে, সূর্য্য ও সূর্য্যপূজার সঙ্গে অশ্বের ঘনিষ্ঠ সংশ্লিষ্টই সূর্য্যের অপর পুত্র, যের ভ্রাতা রেবন্তের অশ্বসংশ্লিষ্টের মূল কারণ। রেবন্ত যে মূলতঃ সৌরদেবতা, অশ্বের তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এর একটি বড় প্রমাণ। স্বন্দপুরাণের প্রভাসথণ্ডের পূর্ব্বোক্ত কাহিনী রে রেবন্ত জন্মহুর্ন্তেই পিতা সূর্য্যের নিকট হতে অশ্ব গ্রহণ করে পলায়ন করেন এবং ছেঁচো করেও পুত্রের নিকট হতে অশ্ব উদ্ধার করতে পারেননি। সেই অশ্বসমেত পরে প্রভাসক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হন। এই কাহিনীর মধ্যে যে ব্যঞ্জনা আছে, বর্তমান এ তা বিশেষ ভাবে স্মরণীয়।

পসংহারে বলব্য যে, বহু অশ্বকে ব্যাপকভাবে বশীকরণ ও ব্যবহার ইতিহাসে আর্ধ্য-ই প্রথম করেন। আর্ধ্যগণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় তাই অশ্বের স্থান গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তাঁদের ধর্মমতে ও ধর্ম্মাচ্ছঠানে সেই কারণে অশ্ব স্বভাবতঃই স্থান ছিল। ভারতে বৈদিক যুগের আর্ধ্য অধিবাসী ও পারস্তের প্রাচীন আর্ধ্য অধিবাসিগণের। তাই ষটেছিল। ব্যবহারিক জীবনে অশ্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকায়, এই ছুই র ধর্মের, বিশেষতঃ সৌরধর্মের সঙ্গে অশ্বের ঘনিষ্ঠ সংশ্লিষ্ট সম্ভবপর হয়েছিল। কিন্তু

1. Gopinath Rao : Elements of Hindu Iconography, vol. I, pt II, pp. 314-15.

2. স্বন্দপুরাণ, ব্রহ্মবণ্ড ১২।১৩।১০ (বঙ্গবাসী সং, তৃতীয় ভাগ, পৃঃ ১৮১২)।

3. স্বন্দপুরাণ-প্রভাসথণ্ড ১১।২৩।৪০ (বঙ্গবাসী সং, সপ্তম ভাগ, পৃঃ ৪৮১৫)।

ভারতের আৰ্য্যোত্তর গোষ্ঠীগুলির অৰ্ধ নৈতিক ও সামাজিক জীবনে অশ্বের স্থান কোনও
 এত গুরুত্বপূর্ণ ছিল বলে জানা যায় না। ভারতের লৌকিক ধর্ম ও সংস্কৃতির মূল
 এসেছিল এই শেবোক্তদের নিকট থেকেই। সম্ভবতঃ সেই কারণে ভারতীয় লৌকিক
 ও সংস্কৃতিতে অশ্বরূপী দেবতা বা অশ্বের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যথোচিত প্রাধান্যসম্পন্ন দেবতা
 নেই বললেও চলে। অস্বতঃ এই স্তরের এমন কোনও দেবতার কথা আমাদের জানা
 যাকে বিশেষত্বের দিক দিয়ে রেবস্তের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে বা রেবস্তের আদি-ও
 বলে বর্ণনা করা চলতে পারে। বর্তমানে অনাৰ্য্য গোঁড়দের মধ্যে 'কোডা পেনু' নামক
 অশ্বদেবতার পূজা প্রচলিত আছে বটে, কিন্তু এই দেবতার কোনও মূর্তি গঠিত হা
 এর প্রতীক এক খণ্ড পাথর।* এ দেবতার পূজার প্রাচীনত্ব সম্পর্কেও সম্ভেদ
 এই জাতীয় কোনও দেবতার সঙ্গে রেবস্তের যোগসূত্র আজ পর্য্যন্ত কেউ প্রতিষ্ঠিত
 পারেননি। তাই এ বিষয়ে বোধ করি, অধিক আলোচনা নিষ্ফল। সুতরাং এ
 আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি, তার ভিত্তিতে এইটুকু বলা চলে যে, রেবস্ত সূর্য্যের
 ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তাসূত্রে বদ্ধ ছিলেন বলেই অশ্বের সঙ্গে তাঁর সংস্রব এত ঘনিষ্ঠ; এবং
 অশ্বারোহিত্ব এবং অশ্ব-সংস্রবের মূলে ভারতীয় সূর্য্যপূজার বৈদিক ও পারসীক
 সম্মিলিত প্রভাব কার্য্যকরী হয়েছিল। এ ক্ষেত্রেও লৌকিক ধর্ম ও সংস্কৃতির কোনও
 এখন পর্য্যন্ত প্রমাণিত হয়নি।

শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, বি. এস-সি.

শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, বি. এস-সি.

ভূমির পরিচয়-বর্ণনা নিম্নরূপ হিষ্ট—

... বিচ্ছিন্ন তালোপেতদশোত্তরশতষ্মপ্রমাণো । সন্নকৈবৰ্ত্তবুত্তি ।

শুণ্ডরিকামণ্ডলাস্তঃপাতি পঞ্চকাণ্ডকাধিক

... যদ্বিগ্ৰহ। পববি। নবতবুত্তরচতুঃশতশ্রীমাণননিষ্মামিনী। পঞ্চনগরী-

বিষয়ান্তঃপাতি একপঞ্চাশদুত্তরশ-

... তপ্তমাপগণেশ্বরসম্মেতগ্রাগপুষ্করিণীষু ।

অর্থাৎ পুণ্ড্রবর্জনভুক্তির অন্তর্গত এই দান। ফাগিতবীথীগাথক্ক অমল...হুই শত দশ-
াণ; কৈবর্তদের যে বৃত্তি প্রদত্ত ছিল, তাহার সন্নিহিত পুণ্ড্রিকামণ্ডলাস্ত্র:পাতি...চারি শত
ই প্রমাণ নন্দিশ্বামিনী ও পঞ্চমগরীবিশ্বাস্ত্র:পাতি একশত একপঞ্চাশ প্রমাণ গণেশ্বর
মত গ্রামপুঙ্করিণীতে (প্রদত্ত হইল)।

উপরোক্ত বর্ণনায় ভূমির যাপ-সম্পর্কীয় 'প্রমাণ' কথাটির অর্থপরিষ্কারের চেষ্টাই হইল যান নিবন্ধের হেতু।

তৃতীয় বিজ্ঞপত্রের বেঙ্গওয়া-লিপিতে (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৫৬শ বর্ষ, ৩য়-৪র্থ পৃষ্ঠা, মংস্পাদিত লিপি দ্রষ্টব্য, ৬২ পৃ.) ২৯ পংক্তিতে দত্ত বস্তুর বর্ণনায় 'একাদশোদমানাখিক-র্দ্বিশপ্তজোণোপেতকুল্যাত্রস্রপ্রমাণাং' কথাটি আছে। এই 'প্রমাণ' কথাটি 'মাপ' কথাটির measure) পরিবর্তে ব্যবহৃত হইয়াছে, বোধ হয়। ২৮ পংক্তিতেও ঐ ভাবে এক বার 'মাণ' কথাটি ব্যবহৃত হইয়াছে দেখা যায়। ডাঃ শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার মহাশয় তাঁহার 'Udamana in Bengal Epigraphs' (১৯৫০, নাগপুর ইতিহাস কংগ্রেসে পঠিত) বন্ধেও এই 'প্রমাণ' কথাটিকে মাপ অর্থেই গ্রহণ করিয়াছেন দেখা যাইতেছে।

কিন্তু মহীপালের বেলওয়া-লিপি 'প্রমাণ'কে ঐ ভাবে গ্রহণ করা যায় না। ডাঃ ঐরাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয়ের অনুদিত কোটিলীয় অর্থশাস্ত্রের অধ্যক্ষপ্রচার অধিকরণের দ্বস্তগত ৩৭শ অঙ্করণে [ভুল ও মানের (বাটের) সংশোধন] ১৩০ পৃষ্ঠায় সম্প্রতি পাঠ চরিত্যম—

“নম্প্রতি ধাত্তাদি মাপিবার জন্ত্র স্রোণ, আচক প্রভৃতি নিরূপণ করা বাইতেছে।) বাস্ত-
বদ্বারা পুরণীয় ২০০ পল পরিমাণের নাম আয়মান স্রোণ। সেইরূপ ১৮৭২ পল^১

পরিমাপের নাম এক ব্যবহারিক দ্রোণ; আবার তেমন ১৭৫৮ পরিমাপের নাম ভাঙ্গনীয় দ্রোণ। এবং ১৬২৩ পল পরিমাপের নাম এক অন্তঃপুরভাঙ্গনীয় দ্রোণ।”

“উক্ত চারিপ্রকার দ্রোণের উত্তরোত্তর $\frac{1}{2}$ অংশ ভাগ কম হইতে থাকিলে ইহা— আচকাদি নাম হইবে, অর্থাৎ ১ দ্রোণের $\frac{1}{2}$ অংশের নাম আচক, ১ আচকের $\frac{1}{2}$ অংশ নাম প্রস্থ ও ১ প্রস্থের $\frac{1}{2}$ অংশের নাম কুড়ুব।”

উক্ত অংশের ‘পল পরিমাণ’ ও ‘পরিমাণ’ শব্দটি লক্ষ্য করিতে অম্ভে করিতেছি। যে পরিমাণ বীজধান্ত যত মাপের ভূমিতে বপন করা যায়, সেই পরিমাণে ঐ পরিমাণ বীজের মাপ দ্বারা পরিচিত করানই এই দেশে রীতি ছিল।* অবস্থায় মহীপালের বেলগুয়া-লিপির ২১০ প্রমাণ, ৪৯০ প্রমাণ ও ১৫১ প্রমাণকে : ২১০ পল পরিমাণ, ৪৯০ পল পরিমাণ ও ১৫১ পল পরিমাণ গণ্য করা যায়, তবে সর্বত্র পরিচিত দ্রোণাদির সাথে একটা সামঞ্জস্যবিধান হইতে পারে।

ডাঃ শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয় আমার লেখাটি পাঠ করিয়া আমাঃ লিখিয়াছেন, “ভূমিতে উৎপন্ন শস্তাদির পরিমাণ দ্বারা যে ভূমির পরিমাণ বা মাপও হুই হইত, তাহা প্রাচীন ইতিহাসের একটা ভণ্ড্য বলিয়াই মনে হয়। আপনার ব্যাখ্যা সমীচীনই বোধ হয়।”

বিষয়টি পণ্ডিত ব্যক্তিদের হাতে আরও বিচারার্থ তুলিয়া দিলাম।

+ এখানে পল কথাটি নাই। ডাঃ বসাক আমার পত্রোত্তরে লিখিয়াছেন যে, এখানে ‘১৭৫ পল ছাপা হওর উচিত ছিল’।

* ডাঃ শ্রীনিহাররঞ্জন রায়ের ঝাঙ্গালীর ইতিহাস, ভূমিবিজ্ঞান অধ্যায় দ্রষ্টব্য, এবং শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের প্রবন্ধ (সা-প-প, ১৩৪০, ২য় সংখ্যা, ৬৩ পৃঃ হইতে) দ্রষ্টব্য।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

অষ্টপঞ্চাশৎ ভাগ

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য



৫৮-শ ভাগ, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার

প্রবন্ধ-সূচি

একখানি মনুষ্যবিক্রয়পত্র—শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী	...
গ্রন্থরসিক রাজনারায়ণ— ঐ ঐ	...
ভাংপর্ষাচাৰ্য—অধ্যাপক শ্রীঅনন্তলাল ঠাকুর	...
বাঙ্গলা সাহিত্যের কতিপয়	
ঐতিহাসিক কাব্য—শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য	...
বাংলা সাময়িক-পত্র (১২৯১-৯৪ সাল)—শ্রীব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	...
বেলঙয়া-লিপির 'প্রমাণ'—শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত	...
বৈষ্ণবধর্মদল—অধ্যাপক শ্রীবতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য	...
মহাব্যাক্তি—শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	...
রেবন্ত—শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস	...
সংস্কৃত গ্রন্থকার অমর মৈত্র—শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী	...